

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ ও

প্রতিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ জেনি খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০৬০৪

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ ও

প্রতিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক

স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মোছাঃ জেনি খাতুন

রোলঃ ২৩১০০১২০৬০৪

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মোছাঃ জেনি খাতুন, আইডিঃ ২৩১০০১২০৬০৪ বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধানেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মাওঃ আলী হাসান

তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ ইসলামি নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ ও প্রতিকার ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Zeni

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

মোছাঃ জেনি খাতুন

আইডিঃ ২৩১০০১২০৬০৪

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব.....	9
নারী শিক্ষা.....	12
মোহাম্মদ (সাঃ) এর দৃষ্টিতে নারীশিক্ষা.....	15
বাস্তব জীবনে নারী.....	19
আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা.....	23
পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ.....	26
ইসলামি শিক্ষার অভাব.....	26
নারী শিক্ষার অভাব এবং পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি:.....	28
নৈতিক শিক্ষার অভাব.....	31
নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক প্রভাব.....	34
দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি.....	34
স্বামীস্ত্রী কলহ.....	38
সন্তানের নৈতিক অবক্ষয়.....	40
প্রতিকার ও সমাধান.....	42
নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি.....	42
ইসলামী নারী শিক্ষায় সামাজিক সহযোগিতা.....	46
উপসংহার.....	48

ভূমিকা

মানবজীবনের উন্নয়ন, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং একটি আদর্শ সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান হলো শিক্ষা। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান, বিবেক, মূল্যবোধ ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। একটি পরিবারের ভিত্তি যেমন নারী, তেমনি সমাজ ও জাতির উন্নয়নের অন্যতম নিয়ামকও নারী। তাই নারী শিক্ষাকে উপেক্ষা করে কোনো জাতির সার্বিক উন্নয়ন কল্পনা করা যায় না। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা নারীর জীবনকে সুশৃঙ্খল, নৈতিক ও আদর্শিক পথে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলাম নারীকে শুধু গৃহস্থালির দায়িত্ব পালনের জন্য নয়, বরং একজন আদর্শ মা, সুশিক্ষিতা স্ত্রী ও সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব অত্যন্ত ব্যাপক। Quran-এ জ্ঞান অর্জনের প্রতি বারবার উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে এবং Prophet Muhammad বলেছেন, “জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।” এই শিক্ষার মাধ্যমে নারী তার অধিকার, কর্তব্য, নৈতিকতা, পারিবারিক দায়িত্ব এবং সামাজিক আচরণ সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। একজন শিক্ষিত নারী পরিবারে শান্তি, সৌহার্দ্য, নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। কারণ পরিবারই সমাজের ক্ষুদ্রতম একক এবং সেই পরিবারের কেন্দ্রবিন্দু হলো নারী।

বর্তমান সময়ে পারিবারিক অবক্ষয় সমাজের একটি গুরুতর সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। পরিবারে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের অভাব, দাম্পত্য কলহ, সন্তানদের নৈতিক অবক্ষয়, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি দায়িত্বহীনতা, পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক অস্থিরতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর পেছনে বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণ থাকলেও ইসলামী নারী শিক্ষার অভাব একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। যখন একজন নারী ইসলামের বিধান, পারিবারিক নৈতিকতা, সন্তান প্রতিপালন ও দাম্পত্য জীবনের দায়িত্ব সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান লাভ করতে পারেন না, তখন তার নেতিবাচক প্রভাব পুরো পরিবারে প্রতিফলিত হয়। একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। তাই মায়ের মধ্যে যদি ইসলামী জ্ঞান, নৈতিকতা ও সচেতনতার অভাব থাকে, তাহলে সন্তানরাও সঠিক আদর্শ ও মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। এর ফলে পরিবারে নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয় এবং সমাজেও

তার বিরূপ প্রভাব পড়ে। একইভাবে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা দাম্পত্য জীবনে অশান্তি ও সম্পর্কের অবনতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে পরিবারে সুখ, শান্তি ও স্থিতিশীলতা নষ্ট হয়।

আধুনিক সমাজে অনেক ক্ষেত্রে নারী শিক্ষা বলতে শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্মমুখী শিক্ষাকে বোঝানো হলেও ইসলামী শিক্ষা নৈতিকতা, চরিত্র গঠন, পারিবারিক মূল্যবোধ ও মানবিক গুণাবলি বিকাশের ওপর গুরুত্ব দেয়। তাই কেবল জাগতিক শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং ইসলামী শিক্ষার মাধ্যমেই একজন নারী নিজেকে এবং তার পরিবারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারেন। একটি আদর্শ পরিবার গঠনে ইসলামী শিক্ষিত নারীর ভূমিকা অপরিসীম।

এই গবেষণায় ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণ করা হবে এবং এর বাস্তবসম্মত প্রতিকার তুলে ধরা হবে। পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারী শিক্ষার গুরুত্বও আলোচনা করা হবে। আশা করা যায়, এই গবেষণা পরিবারে নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে এবং সমাজে পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

এছাড়াও বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর ও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি উদাসীনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পরিবারকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন এবং সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের অভাবে অনেক নারী পরিবার পরিচালনায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা প্রদান এবং দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হন।

ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য শুধু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন নয়; বরং মানুষের চরিত্র গঠন, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা। একজন নারী যখন ইসলামের আলোকে শিক্ষিত হন, তখন তিনি পরিবারে ভালোবাসা, সহনশীলতা ও নৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার অভাবে পরিবারে অসহিষ্ণুতা, দায়িত্বহীনতা ও মূল্যবোধের সংকট তৈরি হতে পারে, যা ধীরে ধীরে পারিবারিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

বিশেষ করে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই গ্রহণ করে এবং মায়ের আচরণ, নৈতিকতা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই একজন শিক্ষিত ও সচেতন মা একটি আদর্শ প্রজন্ম গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু যখন নারী ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না, তখন সন্তানের মধ্যেও ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে সমাজে অপরাধ, অসামাজিক কার্যকলাপ ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। একজন নারী যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করেন, তবে তিনি পরিবারে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই পারিবারিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী নারী শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান গবেষণাটি মূলত ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করবে এবং পরিবার ও সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর প্রতিকার ও সুপারিশ উপস্থাপন করবে। এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এর ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

এছাড়াও বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর ও ভোগবাদী সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক বন্ধন দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাব, ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি উদাসীনতা এবং নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে একজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পরিবারকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন এবং সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হন। কিন্তু ইসলামী জ্ঞানের অভাবে অনেক নারী পরিবার পরিচালনায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, সন্তানদের আদর্শ শিক্ষা প্রদান এবং দাম্পত্য জীবনে ভারসাম্য রক্ষা করতে ব্যর্থ হন।

ইসলামী শিক্ষার মূল লক্ষ্য শুধু ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন নয়; বরং মানুষের চরিত্র গঠন, ন্যায়পরায়ণতা, দায়িত্ববোধ, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করা। একজন নারী যখন ইসলামের আলোকে শিক্ষিত হন, তখন তিনি পরিবারে ভালোবাসা, সহনশীলতা ও নৈতিক পরিবেশ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখেন। অন্যদিকে ইসলামী শিক্ষার

অভাবে পরিবারে অসহিষ্ণুতা, দায়িত্বহীনতা ও মূল্যবোধের সংকট তৈরি হতে পারে, যা ধীরে ধীরে পারিবারিক অবক্ষয়ের দিকে নিয়ে যায়।

বিশেষ করে সন্তান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে মায়ের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিশু তার জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা পরিবার থেকেই গ্রহণ করে এবং মায়ের আচরণ, নৈতিকতা ও আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়। তাই একজন শিক্ষিত ও সচেতন মা একটি আদর্শ প্রজন্ম গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারেন। কিন্তু যখন নারী ইসলামী নৈতিকতা ও আদর্শ সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন না, তখন সন্তানের মধ্যেও ধর্মীয় ও নৈতিক চেতনার ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এর ফলে সমাজে অপরাধ, অসামাজিক কার্যকলাপ ও নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ার আশঙ্কা থাকে।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং পারিবারিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে নারী ও পুরুষ উভয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছে। একজন নারী যদি ইসলামের সঠিক শিক্ষা লাভ করেন, তবে তিনি পরিবারে পারস্পরিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। তাই পারিবারিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী নারী শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত জরুরি।

বর্তমান গবেষণাটি মূলত ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক জীবনে যে নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি হচ্ছে তা বিশ্লেষণ করবে এবং পরিবার ও সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যকর প্রতিকার ও সুপারিশ উপস্থাপন করবে। এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামী নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় এর ভূমিকা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

ইসলামী শিক্ষার গুরুত্ব

ইসলামে শিক্ষা মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শিক্ষা মানুষের জ্ঞান, বিবেক, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের প্রধান মাধ্যম। ইসলাম মানুষকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে জ্ঞানের আলোতে নিয়ে আসার জন্য শিক্ষা অর্জনের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। ইসলামের সূচনাই হয়েছে জ্ঞানার্জনের নির্দেশনার মাধ্যমে।

Quran-এর প্রথম অবতীর্ণ আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন—

“পড় তোমার প্রতিপালকের নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।”

(সূরা আল-আলাক: ১)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব কত বেশি। এখানে “পড়” শব্দটি জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করে এবং মানবজীবনে শিক্ষার অপরিহার্যতা তুলে ধরে। ইসলাম কেবল ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং এমন সব জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহ দেয় যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের কল্যাণ সাধন করে। মহান আল্লাহ আরও বলেন—

“বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান?”

(সূরা আয-যুমার: ৯)

এই আয়াতের মাধ্যমে জ্ঞানী ব্যক্তির মর্যাদা ও সম্মান প্রকাশ করা হয়েছে। ইসলাম শিক্ষিত মানুষকে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে, কারণ জ্ঞান মানুষকে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে সাহায্য করে এবং সঠিক পথে পরিচালিত করে।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন—

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন।”

(সূরা আল-মুজাদালা: ১১)

এখানে জ্ঞানীদের উচ্চ মর্যাদা ও সম্মান সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষা শুধু পার্থিব উন্নতির মাধ্যম নয়; বরং এটি আখিরাতের সফলতার পথও সুগম করে।

Prophet Muhammad শিক্ষা অর্জনের ওপর অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেছেন—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।”

(ইবনে মাজাহ)

এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করেছে। ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্বও সমানভাবে স্বীকৃত। কারণ একজন শিক্ষিত নারী একটি আদর্শ পরিবার ও সমাজ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

অন্য এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন—

“যে ব্যক্তি জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে কোনো পথে চলে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন।”

(সহিহ মুসলিম)

এই হাদিস শিক্ষা অর্জনের মর্যাদা ও ফজিলতকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। জ্ঞান অর্জনকে ইসলাম ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে। তাই একজন মুসলমানের জন্য দ্বীনি ও প্রয়োজনীয় জাগতিক জ্ঞান অর্জন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইসলামে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সৎ, ন্যায়পরায়ণ, দায়িত্বশীল ও নৈতিক চরিত্রসম্পন্ন হিসেবে গড়ে তোলা। শিক্ষা মানুষকে আল্লাহভীরুতা, মানবতা, সহানুভূতি ও নৈতিক মূল্যবোধ শেখায়। ইসলামী শিক্ষা মানুষকে কেবল ব্যক্তিগত উন্নতির দিকেই পরিচালিত করে না; বরং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার মাধ্যমে মানুষ নিজের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হয়। পরিবারে শান্তি প্রতিষ্ঠা, সন্তানদের সঠিকভাবে প্রতিপালন, সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং মানবকল্যাণমূলক কাজ পরিচালনার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

ইসলামের ইতিহাসে জ্ঞানচর্চার এক গৌরবোজ্জ্বল ধারা লক্ষ্য করা যায়। সাহাবিগণ ও মুসলিম মনীষীরা জ্ঞান অর্জন ও জ্ঞান বিতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তারা ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যেও অসামান্য অবদান রেখেছেন। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে ইসলাম জ্ঞান ও গবেষণাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে।

ইসলামে শিক্ষা শুধু জ্ঞান অর্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং এটি মানুষের আত্মশুদ্ধি, নৈতিক উন্নয়ন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। শিক্ষা মানুষের

অন্তরে সত্য, ন্যায় ও মানবতার চেতনা জাগ্রত করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হন এবং সমাজে শান্তি ও কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে সক্ষম হন। এ কারণেই ইসলাম অজ্ঞতাকে অপছন্দ করেছে এবং জ্ঞান অর্জনকে ইবাদতের মর্যাদা প্রদান করেছে।

Quran-এ মহান আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করে বলেন—

“হে আমার প্রতিপালক! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন।”

(সূরা ত্ব-হা: ১১৪)

এই আয়াতের মাধ্যমে বোঝা যায় যে জ্ঞান এমন একটি সম্পদ যার কোনো সীমা নেই। একজন মুসলমানকে সারাজীবন জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। ইসলাম মানুষকে চিন্তা, গবেষণা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সত্য অনুসন্ধানের শিক্ষা দেয়।

ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব এতটাই বেশি যে, Prophet Muhammad বদরের যুদ্ধে বন্দী কিছু কাফিরকে মুক্তির শর্ত হিসেবে মুসলিম শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এর মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তারের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়। ইসলাম এমন একটি সমাজ গঠনের শিক্ষা দেয় যেখানে জ্ঞান, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের চর্চা থাকবে।

শিক্ষা মানুষের চরিত্র গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একজন শিক্ষিত ব্যক্তি সহজেই ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেন। ইসলামী শিক্ষা মানুষকে সততা, ধৈর্য, সহনশীলতা, দায়িত্ববোধ ও মানবসেবার শিক্ষা দেয়। তাই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনের জন্য ইসলামী শিক্ষার বিকল্প নেই। ইসলামে নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষার সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ নারী শিক্ষিত হলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয় এবং একটি আদর্শ প্রজন্ম গড়ে ওঠে। একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক হিসেবে তার চরিত্র ও নৈতিকতা গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই ইসলাম নারী শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে যাতে পরিবার ও সমাজে নৈতিক পরিবেশ বজায় থাকে।

বর্তমান সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধ, পারিবারিক অশান্তি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হলো প্রকৃত শিক্ষার অভাব। শুধু প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়, বরং নৈতিক ও ইসলামী শিক্ষার অভাব মানুষকে মূল্যবোধহীন করে তুলছে। তাই

কুরআন ও হাদিসভিত্তিক শিক্ষা ব্যক্তি ও সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

ইসলামের ইতিহাসে মুসলিম মনীষীরা শিক্ষা ও গবেষণার মাধ্যমে বিশ্বসভ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে মুসলিম শিক্ষাবিদদের অবদান প্রমাণ করে যে ইসলাম জ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করে। তারা কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে ধারণ করে মানবকল্যাণে জ্ঞানকে ব্যবহার করেছিলেন।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামে শিক্ষা মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতার অন্যতম প্রধান উপায়। শিক্ষা মানুষকে আলোকিত করে, নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়তা করে এবং পরিবার ও সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। তাই ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ইসলামী শিক্ষার প্রসার ও চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

নারী শিক্ষা

ইসলামে নারী শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কারণ নারী সমাজ ও পরিবারের অন্যতম প্রধান ভিত্তি। একজন নারী একজন মা, স্ত্রী, কন্যা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রথম শিক্ষক। তাই একজন নারী শিক্ষিত হলে শুধু একজন ব্যক্তি নয়, বরং একটি পরিবার ও সমাজ শিক্ষার আলোতে আলোকিত হয়। ইসলাম নারীকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করেছে এবং তাদের জ্ঞান অর্জনের অধিকার স্বীকৃতি দিয়েছে।

Prophet Muhammad বলেছেন—

“জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর জন্য ফরজ।”

(ইবনে মাজাহ)

এই হাদিস নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। ইসলাম নারীকে শুধু ধর্মীয় শিক্ষা নয়, বরং এমন জ্ঞান অর্জনের প্রতি উৎসাহিত করেছে যা পরিবার, সমাজ ও মানবকল্যাণে কাজে আসে।

নারী শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পরিবার গঠন ও সন্তান প্রতিপালন। একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। শিশুর চরিত্র, নৈতিকতা ও আদর্শ গঠনে মায়ের

ভূমিকা অপারিসীম। একজন শিক্ষিত মা তার সন্তানকে সঠিক ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিতে পারেন এবং তাকে আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হন। অন্যদিকে অশিক্ষিত মা অনেক সময় সন্তানকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন, যার ফলে সমাজে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পেতে পারে।

ইসলামে পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিবারে শান্তি, সৌহার্দ্য ও নৈতিক পরিবেশ বজায় রাখতে নারীর শিক্ষিত হওয়া অত্যন্ত জরুরি। একজন শিক্ষিত নারী স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকেন এবং পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেন। ফলে পরিবারে শান্তি ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারী শিক্ষা সমাজ উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষিত নারী সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি, মানবসেবা, নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক সমস্যার সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারেন। ইসলাম নারীকে সমাজের কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। ইসলামের ইতিহাসে বহু নারী জ্ঞান, শিক্ষা ও মানবসেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন।

বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। আধুনিক সমাজে নৈতিক অবক্ষয়, অপরাধ, পারিবারিক অশান্তি ও মূল্যবোধের সংকট দূর করতে ইসলামী আদর্শে শিক্ষিত নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পরিবারে ধর্মীয় মূল্যবোধ, শালীনতা, সহমর্মিতা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

এছাড়াও নারী শিক্ষা অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নেও সহায়ক। শিক্ষিত নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন। ইসলাম নারীকে সম্মানজনক জীবনযাপন ও আত্মমর্যাদা রক্ষার শিক্ষা দিয়েছে, যা শিক্ষার মাধ্যমেই বাস্তবায়ন সম্ভব।

নারী শিক্ষা একটি জাতির উন্নয়ন ও সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। কারণ একজন নারী শুধু নিজের জীবনকেই প্রভাবিত করেন না, বরং পুরো পরিবার ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের চিন্তা-চেতনা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাই ইসলাম নারীকে জ্ঞান অর্জনের পূর্ণ অধিকার দিয়েছে এবং তাদের শিক্ষালাভকে উৎসাহিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষিত নারী একটি আদর্শ সমাজ গঠনের অন্যতম শক্তি।

Quran-এ মহান আল্লাহ বলেন—

“আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন।”

(সূরা আল-মুজাদালা: ১১)

এই আয়াত নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ ইসলামে জ্ঞান ও শিক্ষার মাধ্যমে মর্যাদা অর্জনের সুযোগ নারী ও পুরুষ উভয়কেই দেওয়া হয়েছে। একজন শিক্ষিত নারী নিজের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন এবং পরিবার ও সমাজে সম্মানের অধিকারী হন।

ইসলামে নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আরও স্পষ্ট হয় Prophet Muhammad-এর জীবন ও কর্ম থেকে। তিনি নারীদের শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করতেন এবং তাদের জন্য পৃথকভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন। সাহাবিয়াগণ বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতেন এবং তা অন্যদের মাঝেও প্রচার করতেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে ইসলাম নারীকে জ্ঞানচর্চা ও সমাজ উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালনের সুযোগ দিয়েছে।

নারী শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে নৈতিক ও ধর্মীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। একজন শিক্ষিত নারী সন্তানদের সঠিক আদর্শ, শিষ্টাচার ও ধর্মীয় মূল্যবোধ শেখাতে সক্ষম হন। শিশুরা পরিবার থেকেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে, তাই মায়ের শিক্ষিত ও সচেতন হওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন সুশিক্ষিত মা সমাজের জন্য আদর্শ নাগরিক গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

শিক্ষিত নারী পারিবারিক সমস্যা সমাধানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি ধৈর্য, সহনশীলতা ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে সক্ষম হন। এছাড়া স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে জ্ঞান থাকার কারণে দাম্পত্য জীবনে সৌহার্দ্য ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

বর্তমান যুগে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন—বাল্যবিবাহ, পারিবারিক সহিংসতা, নৈতিক অবক্ষয় ও কুসংস্কার দূরীকরণে নারী শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষিত নারী নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন। একই সঙ্গে তিনি সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি ও মানবকল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হন।

ইসলামে নারী শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু পার্থিব সফলতা অর্জন নয়; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং একটি ন্যায়ভিত্তিক ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। ইসলামী শিক্ষা নারীর চরিত্র, আচরণ, দায়িত্ববোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ গঠনে সহায়তা করে। ফলে একজন নারী নিজেকে এবং তার পরিবারকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সক্ষম হন। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির জন্য নারী শিক্ষার প্রসার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ অশিক্ষা ও অজ্ঞতা সমাজে দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও নৈতিক অবক্ষয়ের জন্ম দেয়। তাই কুরআন ও হাদিসের আলোকে নারী শিক্ষার প্রসার একটি সময়োপযোগী ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পরিশেষে বলা যায়, নারী শিক্ষা শুধু একজন নারীর অধিকার নয়; বরং এটি পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। একজন শিক্ষিত নারী একটি শিক্ষিত পরিবার ও আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাই ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী নারী শিক্ষার প্রসার ও ইসলামী মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

মোহাম্মদ (সাঃ) এর দৃষ্টিতে নারীশিক্ষা

নবীজীর (স) সবচেয়ে বড় অর্জন, সবচেয়ে বড় কীর্তি যদি কিছু থাকে, তাহলে সেটা হচ্ছে নারী শিক্ষার অধিকার। যেটা আমাদের অধিকাংশ নারী এই ব্যাপারে সচেতন নন।

নবীজী (স) তাঁর জীবনে নারীকে যে সম্মানে ভূষিত করেছেন যে মর্যাদা যে অধিকার দিয়েছেন বহু আধুনিক সমাজ সে অধিকার দিতে পারে নাই।

একজন মানুষ আসলে তার সবচেয়ে দুর্বলতা হচ্ছে অশিক্ষা, শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকা। কারণ একজন মানুষের সবচেয়ে বড় শক্তি হচ্ছে জ্ঞান এবং শিক্ষা।

নবীজী (স) খুব পরিষ্কার বলেছেন, জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেকটা নারী এবং পুরুষের জন্যে ফরজ। পুরুষের জন্যে ফরজ, নারীর জন্যে নফল এটা বলেন নাই। বলেছেন, নারী এবং পুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেকের জন্যে জ্ঞানার্জন ফরজ।

মসজিদে নববীতে মেয়েরা একদিকে বসতেন, পুরুষরা একদিকে বসতেন। কখনো নবীজী (স) পুরুষদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন, কখনো তিনি মহিলাদের দিকে তাকিয়ে কথা বলতেন। আমাদের অধিকাংশ মহিলা এটা আমরা জানি না।

মুহাম্মদ (সা.)-কে যে গুরুত্ব ও মর্যাদা দান করেছেন, তা ভাস্বর হয়ে থাকবে মহাকাল। তিনি নারীকে যে অধিকার মানবতার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আজ থেকে প্রায় ১৫০০ বছর আগে সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। নারীর শিক্ষা বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে ইতিহাসের কালজয়ী অধ্যায়ের সূচনা করেছেন।

প্রদান করেছেন, তা অতীত ও বর্তমানের কোনো ব্যক্তি, আইন, জীবনপদ্ধতি দান করতে পারেনি। জ্ঞান অর্জনের বিষয়ে নারী-পুরুষের ব্যাপারে নবীজী (সা.)-এর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে রাসুল (সা.) বলেন, ‘প্রত্যেক (নর-নারী) মুসলমানের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরজ।

’ (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ২২৪)

উক্ত হাদিসে জ্ঞান অর্জনের ব্যাপারে নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘আল্লাহ তাআলা সুরা বাকারার দুই আয়াতের মাধ্যমে শেষ করেছেন, যা আমাকে আরশের নিচের ভাণ্ডার থেকে প্রদান করা হয়েছে। অতএব এগুলো তোমরা নিজেরা শেখো ও তোমাদের নারীদের শেখাও।’ (দারেমি, হাদিস : ৩৪৩০)

আনসারি নারীরা দিনের গভীর জ্ঞানার্জনে অনেক আগ্রহ রাখতেন, তাই আয়েশা (রা.) তাদের প্রশংসা করে বলেন, ‘আনসারি নারীরা কত ভালো! দিনি জ্ঞানার্জনে লজ্জা তাদের প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি করে না।

(মুসলিম, হাদিস : ৩৩২)

মূলত ইসলাম শিক্ষা ও জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে নর-নারীভেদে ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেনি; বরং এটি সবার জন্যই অবধারিত করা হয়েছে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর মর্যাদা ও শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতিকল্পে দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে এমন সব পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, যাতে তা মানুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কন্যাদের প্রতি পুত্রদের সমান গুরুত্ব দেওয়ার প্রতি

দেওয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়ে রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘কারো যদি একজন কন্যাসন্তান থাকে এবং সে তাকে হত্যা করেনি, কোনো ধরনের অবহেলা করেনি এবং

পুত্রসন্তানকে কন্যাসন্তানের ওপর কোনো প্রকার প্রাধান্য দেয়নি। আল্লাহ তাকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৫১৪৬)

মহানবী (সা.) বিভিন্ন সময়ে নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা দেওয়ার জন্য নারীর মাতা-পিতাকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন

তিনি বলেছেন, ‘যে তিনটি কন্যাসন্তান অথবা তিন বোন প্রতিপালন করল, তাদের শিষ্টাচারিতা শিক্ষা দিল এবং তাদের প্রতি দয়া করল, অবশেষে আল্লাহ তাআলা তাদের মুখাপেক্ষীহীন করে দিলেন। তাহলে তার জন্য আল্লাহ তাআলা জান্নাত অবধারিত করে দেবেন। তখন জনৈক সাহাবি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল, দুটি কন্যা প্রতিপালন করলেও? তিনি জবাবে বলেন, দুটি করলেও।’ (মিশকাত, হাদিস : ৪৯৭৫)

অন্য হাদিসে রাসুল (সা.) নারীদের উত্তম শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, ‘তোমরা নারীদের উত্তম উপদেশ দাও (অর্থাৎ উত্তম শিক্ষায় শিক্ষিত করো)।’ (বুখারি : ৩৩৩১)।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে এক হাদিসে। একবার এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, ‘হে আল্লাহর রাসুল, আপনার হাদিস তো শুধু পুরুষেরা শুনতে পায়। সুতরাং আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিন, যেদিন আমরা আপনার কাছে আসব, আল্লাহ আপনাকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে আপনি আমাদের শেখাবেন।’ তিনি বলেন, ‘তোমরা অমুক অমুক দিন অমুক অমুক জায়গায় একত্র হবে।’ সে মোতাবেক তারা একত্র হয়। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং আল্লাহ তাঁকে যা কিছু শিখিয়েছেন তা থেকে তাদের শিক্ষা দেন। (বুখারি, হাদিস : ৭৩১০)

আশ-শিফা বিনত আবদুল্লাহ (রা.) বলেন, একবার আমি হাফসা (রা.)-এর কাছে ছিলাম, তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেন, ‘তুমি কি ওকে (হাফসাকে) যেভাবে লেখা শিখিয়েছ, সেভাবে পিঁপড়া (পোকা) কামড়ের ঝাড়ফুক শিক্ষা দেবে না?’ (আবু দাউদ, হাদিস : ৩৮৮৭)

রাসুল (সা.) ক্রীতদাসীকেও শিক্ষাদানের ব্যাপারে মুসলিম সমাজকে উৎসাহিত করেন। অথচ তাদের ব্যাপারে কেউ কোনো দিন চিন্তাও করত না। তিনি বলেন, ‘কারো যদি ক্রীতদাসী থাকে, আর সে তাকে উত্তমরূপে বিদ্যা ও শিষ্টাচার শিখিয়ে

স্বাধীন করে দেয়। অতঃপর তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করে, তাহলে তার জন্য দুটি পুরস্কার আছে।' (বুখারি, হাদিস : ৯৭)

এভাবে মহানবী (সা.) মুসলিম নারীদের অন্তরে জ্ঞানার্জনের তীব্র স্পৃহা সৃষ্টি করেছিলেন। এর ফলে হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে ইসলামের প্রথম যুগের নারীরা ব্যাপকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। ইবনে সাদ তাঁর 'তাবাকাতে' ৭০০ নারীর নাম উল্লেখ করেছেন, যাঁরা রাসুল (সা.) থেকে বা তাঁর সাহাবিদের থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আসকালানি (রহ.) তাঁর 'আল-ইসাবাহ ফি তামায়িজিল হাদিস' নামক গ্রন্থে এক হাজার ৫৪৩ জন নারী হাদিসবিশারদের নাম উল্লেখ করেছেন এবং তাঁদের পাণ্ডিত্য ও বিশ্বস্ততার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিয়েছেন। উম্মুল মুমিনিন আয়েশা (রা.) ছিলেন নারী শিক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহুসংখ্যক সাহাবি ও তাবেঈন তাঁর কাছ থেকে হাদিস বর্ণনা করেন এবং ইলমে দ্বীন শিক্ষা লাভ করেন।

নবী (সা.)-এর যুগে এবং পরবর্তী যুগগুলোতেও মুসলিম নারীরা চিকিৎসাবিজ্ঞান, কাব্য, সাহিত্য, আইন প্রভৃতি জ্ঞানচর্চায়ও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমকালীন অনেক নারী চিকিৎসাসেবার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যুদ্ধে আহতদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে তারা নবী সা.)-এর সঙ্গে যুদ্ধেও গমন করেছিলেন। নুসাইবা বিনতে কাব আল-আনসারী (রা.) ছিলেন মদীনার একজন প্রখ্যাত নারী চিকিৎসক। উম্মে আম্মারা নামে বেশি খ্যাত এই নারী সাহাবি।

রুফাইদা বিনতে সাদ আল-আসলামিয়া (রা.) ছিলেন মুহাম্মদ (সা.)-এর সমকালীন মদীনার অন্য একজন নারী চিকিৎসক। তাঁকে 'ইসলামের প্রথম নার্স' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি মূলত তাঁর চিকিৎসক পিতা সাদ আল-আসলামির নিকট থেকে চিকিৎসাবিদ্যা সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় এতই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুদ্ধে আহত সব সৈনিককে তার কাছে চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করতেন।

শিফা বিনতে হারেস ইসলামে সর্বপ্রথম পারিবারিক শিক্ষিকা ছিলেন। আর উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান ও উম্মে শারিক ইসলামের প্রসিদ্ধ দাঈ ছিলেন। নারী তাবেঈনদের মধ্যে হাফসা বিনতে সিরিন ইবাদত, ফিকহ ও কোরআন-হাদিসের

সুগভীর জ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। ইমাম শাফেয়ি (রহ.) একজন নারী শিক্ষিকা নাফিসা বিনতুল হাসানের ক্লাসে অংশগ্রহণ করতেন এবং তাঁর থেকে হাদিস শুনতেন। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহ.) ৮০ জনের বেশি নারীর থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ রকম মহীয়সী নারীদের নিয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়েছে, যা অধ্যয়নে আমাদের উজ্জ্বল অতীত অনুভূত হয়।

মধ্যযুগেও মুসলিম নারীরা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফলতার সঙ্গে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। সুতাইতা আল-মাহামালি নামের এক নারী গণিতবিদ বাগদাদের এক বিদ্যোৎসাহী পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন বাগদাদের একজন বিচারপতি ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিত্ব। গণিতের বিভিন্ন শাখায় তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে এভাবেই বহু মুসলিম নারী জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় শ্রেষ্ঠত্ব ও যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছিলেন।

বাস্তব জীবনে নারী

বাস্তব জীবনে মেয়েদের পরিচয় মেয়ে হিসেবে, বোন হিসেবে, স্ত্রী হিসেবে এবং মা হিসেবে। মেয়ে হিসেবে যখন সে পিতার পরিবারভুক্ত থাকে তখন তার আশেপাশে থাকে মা, বোন, ভাই, বাপ ইত্যাদি আরও অনেকে। একটি মেয়ে যদি ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়, তার যদি যথেষ্ট পরিমাণে ইসলামী জ্ঞান থাকে তবে সে পরিবেশের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে পারে। সে তার ভাই-বাপকে ইসলামের পথে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে তাদের প্রতিটি কর্মে। বোনের অনুপ্রেরণা, মেয়ের উৎসাহ অনেককে ভাল কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

মিসরের হামিদা কুতুব কয়েদখানাকেও ভয় করেননি সত্যসন্ধানী ভাইয়ের সহযোগিতা করতে গিয়ে। জয়নার আল গাজ্জালীর স্বামী যখন ইখওয়ানের সাথে সম্পৃক্ত হবার কারণে নাসের সরকারের নির্যাতনের আশঙ্কা করেছিলেন তখন স্ত্রীর শক্ত ঈমান দৃঢ় জবাব তাকে শুধু আশ্বস্তই করেনি বরং তিনি দোয়া করেছিলেন, “দোয়া করি এই মহান কাজে অবিচল থাকার জন্য আল্লাহ তোমাকে সহ সাহস এবং উৎসাহ দান

করুন। আমার জীবনসাশে যদি আমি ইখওয়ানের সাফল্য দেখে যেতে পারি তাহলেই কতইনা সুখী হবো। খোদা যেন তোমাদের প্রচেষ্টায় ইসলামী সরকার কায়েম করেন। হয়! নবীন হয়ে যদি আমিও তোমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে পারতাম।” মেয়েরা যখন বড় হয়ে সংসারে প্রবেশ করে তখন তার দায়-দায়িত্ব বেড়ে যায়। সে তখন একজনের স্ত্রী। গোটা একটা বাড়ীর দায়-দায়িত্ব হয়ত তার ঘাড়ে এসে পড়তে পারে। সেখানে সবার উপর তার দায়িত্ব আরও ব্যাপক। দুনিয়াতে কোন স্বামীই স্ত্রীর সহযোগিতা ছাড়া গঠনমূলক কোন কাজ করতে পারে না। কর্মশ্রান্ত পুরুষ যদি সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে তার স্ত্রীর নির্মম মুখ আর কঠোর মেজাজ দেখে, প্রতি পদে পদেই যদি সে তার স্ত্রী কর্তৃক বাধার সম্মুখীন হয়, যদি সে অনুভব করে যে, তার জীবন যে মহৎ উদ্দেশ্যের দিকে ধাবিত হচ্ছে তার প্রতি তার স্ত্রীর বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি নেই তবে সে তার কর্ম প্রেরণা কোথায় পাবে? বাইরের ঝড়-ঝঞ্ঝা, দুঃখ-কষ্টের মোকাবিলা করার শক্তি সাহস কোথা থেকে আসবে? ঘরের বিরক্তিকর পরিস্থিতি স্বভাবতই তাকে বহির্মুখী করে দেবে এবং তার সমস্ত প্রতিভা লোপ পেতে থাকবে। সে হয়ে উঠবে উচ্ছৃঙ্খল। আর উচ্ছৃঙ্খল মানুষ দ্বারা দুনিয়ার কোন ভাল কাজ সম্ভব নয়।

স্ত্রীর সহযোগিতার কারণে মানুষ যেমন অসাধ্য সাধন করতে পারে তেমনি তার অসহযোগিতা এবং অবহেলা একটি অনন্য প্রতিভাকে সমূলে বিনষ্ট করে ধ্বংসের পথে টেনে আনতে পারে। কাজেই সবকিছু বিচার-বিবেচনা করে এ পথে চলা দরকার। একজন আদর্শ মুসলিম স্ত্রী স্বামীর সৎকর্মে অনুপ্রেরণা, অসৎকর্মে বাধা এবং জিহাদী প্রেরণা ও ন্যায়ের পথে রুখে দাঁড়ানোর শক্তি যোগান। স্বামীর চরিত্রে কাপুরুষতা বা ইসলাম বিমুখতা সহ্য না করে, তিনি ধৈর্য ও সাহসিকতার প্রতীক হিসেবে পাশে থাকেন।

সে তার স্বামীকে বুঝিয়ে দিবে যে, ইসলামের পথে যে কোন ত্যাগ এবং কুরবানীকে মেনে নিতে সে রাজী আছে, কিন্তু শয়তানী পথে হাজারো আরাম বিলাসও সে বরদাশত করবে না। যেমন বলেছিলেন ফেরাউনের স্ত্রী আছিয়া। এই প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর যুগে এক মহিলার ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার স্বামী অসুস্থ পুত্রকে রেখে বাইরে গেছেন কাজে। ইতিমধ্যে সে ছেলে মারা গেছে। রাত্রিতে কর্মক্লান্ত হয়ে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন তার স্ত্রী ছেলেকে কাফনে ঢেকে শুইয়ে রেখেছেন। তিনি যখন সন্তানের খবর জিজ্ঞেস করলেন তখন বুদ্ধিমতি স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে

মৃত্যুর খবর না দিয়ে বললেন, আশা করা যায় সে এখন শান্ত আছে। তারপর তিনি স্বামীর সেবা-যত্ন করলেন। সকালে যখন সুস্থ হয়ে গোসল সেরে নামায পড়তে যাবেন তখন তিনি তার পুত্রের মৃত্যু খবর জানালেন। ঐ সাহাবা যখন হযরত (সা)-এর কাছে যেয়ে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করলেন তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তোমার স্ত্রীর উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং পুরস্কার স্বরূপ তোমাদের গত রাতের মিলনে আল্লাহ পাক তার এক প্রিয় বান্দাই সৃষ্টি করবেন। তাদের সেই পুত্রই পরবর্তীকালে ইসলামের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে গেছেন। দেখুন মায়ের কি অপূর্ব ধৈর্য। পুত্রের শোকে বিচলিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি ক্লান্ত স্বামীকে তৎক্ষণাৎ বিব্রত করেননি। বরং সেবা দিয়ে তাকে আবার কর্মোপযোগী করে তুলেছেন এবং রেখে গেছেন আমাদের জন্যে এক উজ্জ্বল আদর্শ।

এরপর আসে মা হিসেবে মেয়েদের ভূমিকার কথা। আজকের নারী সমাজের সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান কাজ হচ্ছে আদর্শ মা হওয়ার চেষ্টা করা। একজন আদর্শ মা একটি পরিবারের ভিত্তি এবং একটি আদর্শ পরিবার একটা আদর্শ সমাজের ভিত্তি। আজকে বিজ্ঞানের চরম উন্নতির যুগে প্রমাণিত হয়েছে বাপ-মায়ের চরিত্র সন্তানের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে সন্তান যখন মায়ের গর্ভে থাকে তখন মায়ের স্বভাব, হাব-ভাব, আচার-আচরণ ইত্যাদি সন্তানের মানসিকতা গঠনের উপর একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে এবং সন্তান যখন বড় হয় তখন তার মধ্যে সেই গুণাগুণগুলো লক্ষ্য করা যায়। কাজেই দুঃশরিত্র বা খারাপ স্বভাবের মাতা-পিতার সন্তান কখনও আদর্শ সন্তান হতে পারে না। ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই, যত জ্ঞানী গুণী এবং উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এই দুনিয়াতে এসেছেন তাদের প্রত্যেকের মাতাই ছিলেন অনেক মহৎ গুণসম্পন্না উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি ওমর ইবনে আবদুল আজিজের কথা। তাঁর নানী দুধ বিক্রি করে সংসার চালাতেন। একদিন দুধে পানি দেয়ার জন্যে তাঁকে বলা হয়েছিল। তখন ছিল দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত কাল। দুধে পানি মিশানো তখনকার দিনে ছিল সরকারীভাবে নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু তাকে বলা হয়েছিল যে খলীফা তো আর এখানে নেই কাজেই দুধে পানি মিশালে কেউ তাকে দেখতে পাবে না। তখন তিনি যদিও ছোট্ট বালিকা মাত্র তবুও গভীর খোদা প্রেম ছিল তার অন্তরে। তিনি বললেন যে, খলীফা না দেখলেও আল্লাহ তো দেখতে পাচ্ছেন। কাজেই তিনি দুধে পানি মেশাতে

পারবেন না। হযরত ওমর ফারুক ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এই কথোপকথন শুনতে পান এবং এই বালিকাকে পুরস্কৃত করেন। সেই মহিলারই নাতি ওমর ইবনে আবদুল আজিজ। কাজেই এই খোদা প্রেমের মহৎগুণ মেয়ের মাধ্যমে নাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। হযরত আবদুল কাদির জিলানীর (র) জীবনী আলোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই যে, অপূর্ব সবগুণের সমাবেশ ছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর মা এবং বাপ উভয়েই ছিলেন তাকওয়া এবং পরহেজগারীতে শীর্ষস্থানীয়। তাঁর পিতার আপেল খাওয়ার ঘটনা কারও অজানা নয়। অন্যদিকে তাঁর মাতাও ছিলেন পর্দানশীলা, গভীর ইসলামী জ্ঞান সম্পন্না এবং অত্যন্ত সুন্দরী রমণী। সৈয়দ আহমদ শহীদ বেরেলভী যিনি পাক-ভারত উপমহাদেশে মুজাহিদ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন, তাঁর মায়ের জীবনী আলোচনা করলেও আমরা দেখতে পাই, তিনি একজন আদর্শ মহিলা ছিলেন। মাওলানা মুহাম্মদ আলী, শওকত আলী ভ্রাতৃদ্বয় যারা খেলাফত আন্দোলনের পুরোধা ছিলেন তাদের মাতা একজন মহীয়সী মহিলা ছিলেন। তিনি নানাভাবে প্রেরণা যুগিয়েছেন তাঁর পুত্রদেরকে বিজাতীয় শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইতে। কাজেই আমরা দেখতে পাই একটি নারীর কারণে একটি যুগের সৃষ্টি হতে পারে।

পুরণেশ্বরী কর্মব্যস্ত পরিবারের সন্তান এবং অন্যান্য দিকে লক্ষ্য দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু সাধারণত সন্তানেরা ছোট বেলায় সারাক্ষণই মায়ের কাছে থাকে। সে মায়ের সমস্ত কাজ-কর্ম দেখে এবং তা অনুসরণ করা চেষ্টা করে। মা সন্তানদের প্রাথমিক শিক্ষিকা।

শিশু সন্তানদের ট্রেনিং এর ব্যাপারে হযরত লোকমান (আ)-এর যে শিক্ষা কুরআনে সূরা লোকমানে উল্লেখ করা হয়েছে, আদর্শ মাতা হিসেবে সন্তানদেরকে সেই শিক্ষাই দিতে হবে।

শিক্ষাগুলো নিম্নরূপ:

এক: শিশুদেরকে শিরকের বিরুদ্ধে সজাগ সচেতন করা এবং এ থেকে বিরত রাখা।

দুই: আল্লাহ সম্পর্কে তাদেরকে সঠিক ধারণা দেয়া। তিনি যে সূক্ষ্মদর্শী মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কাজকেও দেখেন একথা তাদের মনে দৃঢ়মূল করে দেয়া।

তিন: মা-বাপের সেবা করা।

চার: ছোটবেলা থেকেই নামায পড়তে অভ্যস্ত করা।

পাঁচ:তাদেরকে যাকাত, দান-খয়রাতে অনুপ্রাণিত করা ও দুঃস্থ মানবতার সেবায় উদ্বুদ্ধ করা।

ছয়:সৎকাজের আদেশ দান ও অসৎকাজ থেকে বিরত রাখার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করা।

সাত: অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার কাজে বাধা প্রতিবন্ধকতার মুকাবিলায় ধৈর্যের অনুপ্রেরণা দান।

আট:মানুষের প্রতি মনোযোগী ও বিনয়ী হওয়া অহংকারী না হওয়া।

নয়:চাল-চলন, আচার-ব্যবহারের ব্যাপারে মার্জিত, ভদ্রোচিত ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা।

দশ: বিনয়ী ও ভদ্রোচিত ভাষায় মানুষের সাথে কথাবার্তা বলতে অভ্যস্ত করা।

ব্যক্তিগতভাবে এ শিক্ষা অনুযায়ী সন্তানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করলেও পারিপার্শ্বিকতা ছেলে-মেয়েদের মন-মানসিকতার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আমরা বর্তমান সমাজের দিকে তাকালে দেখতে পাই, চারিদিকে নোংরামি, অশ্লীলতা আর উলঙ্গপনার সয়লাব। মেয়েরা নানাভাবে তাদের দেহ প্রদর্শন করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু যদি বাড়ীর মায়েরা এ ব্যাপারে সচেতন এবং ছোট বেলা থেকে এর বিরুদ্ধে ঘৃণার মনোভাব গড়ে তোলেন তবে এ সমস্যার সয়লাব থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া যায়।

আদর্শ জাতি গঠনে নারীর ভূমিকা

আদর্শ জাতি গঠনে নারীদের অবদানকে ছোট করে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

নারীদেরকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে আদর্শ ও সমৃদ্ধ জাতি সহায়তা নেয় আবশ্যিক। কারণ, নারীরা জাতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। মুসলিম সমাজে নারীদের যথেষ্ট কর্মসংস্থান রয়েছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পুরুষের চেয়ে নারীদের অগ্রাধিকার প্রদান দেওয়া যেতে পারে। যেমন, কিন্ডারগার্টেন, নার্সারি, প্লে-গ্রুপ এবং ইবতেদায়ী ও প্রাইমারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার পেশায় নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, একজন নারী স্বভাবগতভাবে বাচ্চা ও শিশুদের পাঠদানে অধিক উপযুক্ত ও অধিক সামর্থবান। এ কাজ নারীদেরকে তাদের অন্যান্য দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদানও করে না। এজন্য অনেক নারীই নিজেকে তাদের কাজের কিছু সময় বা

অর্ধেক সময় স্বল্প মজুরীতে/বেতনে শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত করতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কারণ, শিক্ষকতা এমন একটি পেশা যা নারীদেরকে তাদের কাজে ও দায়িত্ব পালনে বাধা সৃষ্টি করে না। বরং নারীদের মাতৃত্ব ও পারিবারিক দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করে। এমনকি সমাজে এমন কিছু নারী রয়েছে, যারা পারিবারিক ও মাতৃত্বের দায়িত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, তাদের জন্য এমন পেশা আরও অধিক উপযোগী। কিন্তু তারপরও কোনো মুসলিম বিশ্ব তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে এ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করে না। তারা এ শিক্ষকতার পেশাকে শিক্ষক-শিক্ষিকার মধ্যে রুটিন অনুযায়ী ভাগাভাগি করে খুব সহজেই কাজে লাগাতে পারতো। এমনকি এ ধরনের অন্যান্য যথেষ্ট পরিমাণ কর্মস্থল রয়েছে, যেগুলো সিস্টেম অনুযায়ী নারী-পুরুষের মধ্যে ভাগাভাগি করে কাজে লাগিয়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করতে পারত।

পরিপূরক ও সমাজের অংশ সে মনোভাব অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

সাধারণত ২০ (বিশ) বছর বয়সেই একজন নারী তার শিক্ষা জীবনের অনার্স, মাস্টার্স, বা ডিপ্লোমা কোর্স শেষ করতে সক্ষম হয় বা শেষের পর্যায়ে চলে যায়। তেমিনভাবে এই বয়সেই একজন নারী তার মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনে এবং সুস্থ সবল সন্তান ভূমিষ্ঠ ও তার যথাযথ লালন-পালনের ব্যবস্থা গ্রহণে শারীরিক ও মানসিকভাবে সর্বাধিক উপযুক্ত হয়ে থাকে।

এজন্য নারীদেরকে এ বয়স থেকে অন্তত চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখা উচিত ও কর্তব্য, যাতে অন্তত তাদের শেষ সন্তানটি পর্যন্ত মায়ের লালন-পালন আদর যত্ন ও তা'লীম- তরবিয়তের ভেতর দিয়ে আত্মিক, মানসিক ও শারীরিকভাবে আত্মনির্ভরশীল হয়ে গড়ে উঠতে পারে।

এরপর যখন একজন নারী তার মাতৃত্বমূলক দায়িত্ব পালনের ভেতর দিয়ে তা'লীম-তরবিয়ত সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে মমতাময় অভিজ্ঞতা অর্জন করে ফেলবে। তখন তাকে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের পরে সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত করতে হবে। তখন থেকে পঁয়ষাট থেকে সত্তর বছর বয়স পর্যন্ত তাকে সামাজিক দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত রাখা উচিত। কারণ, নারীদের সাধারণত পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে জীববিজ্ঞানের তত্ত্ব অনুযায়ী হরমোনজনিত কারণে স্বভাবগতভাবে নারীর মাসিক চক্র বন্ধ হয়ে যায়। নারী তার সন্তান ধারণ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। তখন হরমোন-জনিত কারণে পুরুষের তুলনায়

নারী অধিক সবল ও শক্তিশালী হয়ে উঠে। তেমনিভাবে স্বাভাবিক অবস্থায় নারীর আয়ুষ্কাল বা বয়স পুরুষের তুলনায় দীর্ঘ হয়ে থাকে। এজন্য নারীকে ৬৫-৭০ বছর বয়স পর্যন্ত সামাজিক কাজে বা পেশাগত কাজে নিয়োজিত রাখা উচিত।

কিন্তু আমরা পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার আলোকে নারীদেরকে তাদের ফুটন্ত যৌবনে মাতৃত্বের ভূমিকা থেকে দূরে সরিয়ে সামাজিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালনে নিয়ে আসি। আবার যখন মাতৃত্বের বয়স শেষ হয়ে যায়, তখন তাদের সামাজিক আর্থিক দায়িত্ব পালনের দরজা বন্ধ করে দেই অর্থাৎ তাদের অবসর জীবনে চলে যেতে হয়। এভাবে পশ্চিমাদের অনুসরণে আমরা নারীদের মান-সম্মান ভুলুণ্ঠিত করে মাতৃত্বের অপমান করছি। অথচ আমাদের অবশ্যই উচিত ও কর্তব্য ছিল যে, নারীদের জন্য তাদের সঠিক বয়সে সম্পূর্ণ আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। কারণ, এতে একদিকে যেমন নারীদের জন্য আলাদা কর্মস্থল ও কাজের সেক্টর এবং ব্যবস্থা করাও সম্ভব, অন্যদিকে তেমনি নারীরা ছলে-বলে হোক আর কৌশলে হোক অথবা জোরপূর্বক হোক কোনো পরপুরুষের কাছে দুর্বলতার শিকার হয়ে মাথা নত না করে নিজেরাই আত্মিক, মানসিক ও মানবিক মূল্যবোধ ও ভারসাম্য রক্ষা করে দেশ ও জাতির সেবা করতে পারে। যদি নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা কর্মস্থলের ব্যবস্থা না করে যৌথ কর্মস্থলের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে সেখানে হয়তো জৈবিক দুর্বলতার কারণে না হয় বস বা মালিককে খুশি করার কারণে অথবা নিজের ক্যারিয়ার গঠন ও পদোন্নতিসহ নানা কারণে জৈবিক সম্পর্ক গড়ে উঠবে এবং মানবিক বিপর্যয় ঘটবে। ভেঙ্গে যাবে পারিবারিক সম্পর্ক ও স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন। যার বাস্তব চিত্র আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থায় দেখতে পাচ্ছি। কারণ, স্বভাবগতভাবে নারী-পুরুষ একে অপরের প্রতি দুর্বল। তারপর একই স্থলে দীর্ঘ দিনের জন্য ব্যস্ততায় আরও দুর্বল হওয়াটাই স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। এটিই হচ্ছে আমাদের ইসলামী শরী'আত ও পশ্চিমা জীবন ব্যবস্থা ও সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট্য।

সুতরাং আমাদেরকে অবশ্যই সামাজিক বিষয়ের সাথে সাথে অর্থনৈতিক বিষয়ে পরিকল্পনা গ্রহণে এমনভাবে গুরুত্ব দিতে হবে, যেন শুরু করার আগেই শেষ না হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রোডাকশন বা ফলাফল লাভ করা পর্যন্ত উৎপাদনের সকল উপকরণ যথাযথ ব্যবহারের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। কারণ, অর্থনৈতিক বিষয়টি

একেবারে সহজ বিষয় নয়, বরং এ বিষয়ে পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে।

তেমনিভাবে আমাদেরকে নারী ও পরিবার কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। যাতে সঠিকভাবে ফলাফল লাভের মাধ্যমে সকল প্রকার প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করে আমাদের লক্ষ্যস্থলে পৌঁছতে পারি।

তেমনিভাবে আমাদেরকে অবশ্যই ইসলামী শরী‘আতের আলোকে নারীদের ইজ্জত, সম্মান, মর্যাদা ও মূল্যবোধ রক্ষা তাদের মাতৃত্বমূলক দায়িত্বে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে দেশ ও জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির লক্ষ্যে নারীদের জন্য আলাদা কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। সমাজে নারী-পুরুষ একে অপরের পরিপূরক ও সমাজের অংশ সে মনোভাব অবশ্যই তৈরি করতে হবে।

পারিবারিক অবক্ষয়ের কারণ

ইসলামি শিক্ষার অভাব

ইসলামি শিক্ষার মাধ্যমে পরিবারে সৃষ্টি হয় পারস্পরিক সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ; আর সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয় ন্যায়, ইনসাফ ও শান্তি। ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনেও ইসলামি শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ইসলামি শিক্ষার প্রধান উৎস হলো কোরআন ও হাদিস। আল্লাহ বলেন, ‘হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবারকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।’ (সূরা তাহরীম)। এই আয়াত প্রমাণ করে যে ইসলামি শিক্ষার প্রচলন সর্বপ্রথম পরিবার থেকেই শুরু হওয়া উচিত।

সন্তানদের ছোটবেলা থেকেই দ্বীনি শিক্ষা দেওয়া গেলে তারা নৈতিকভাবে গঠিত হয়। তারাই পরে জাতির কাছে ইসলাম প্রচার করবে। তাই প্রত্যেক পিতা-মাতার জন্য উচিত হলো, সন্তানকে কোরআন-হাদিসের আলোকে ইসলামি শিক্ষা দেওয়া।

পরিবারে ইসলামি শিক্ষাচর্চার মাধ্যমে সন্তানরা সঠিক ও ভুলের পার্থক্য শেখে, বড়দের প্রতি সম্মান ও ছোটদের প্রতি সহানুভূতি গড়ে ওঠে। রাসূল (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা প্রত্যেকে একজন দায়িত্বশীল এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।’ (বোখারি ও মুসলিম)।

অভিভাবকরা যদি ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হন এবং তা নিজেদের জীবনে অনুসরণ করেন, তবে সন্তানরাও সহজেই সেই শিক্ষায় বেড়ে উঠবে। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।’ (সূরা তাহরিম : ৬)। এই আয়াত পরিবারের ওপর দ্বীনি শিক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘হে আমার বৎস, তুমি আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছু শরিক করো না, নিশ্চয়ই শরিক মহা অন্যায়।’ (সূরা লুকমান : ১৩)। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায়বিচার, সদাচরণ ও আত্মীয়স্বজনকে তাদের হক প্রদান করতে।’ (সূরা নাহল : ৯০)। তিনি আরও বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ (সূরা আহজাব : ২১)। পরিবার ও সমাজে রাসুল (সা.)-এর জীবনী অনুসরণ করাই প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা। তিনি আরও বলেছেন, ‘হে বৎস, সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ দাও এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করো।’ (সূরা লুকমান : ১৭)।

এক আদর্শ পিতা কীভাবে সন্তানকে উপদেশ দিচ্ছেন, তা এই আয়াতে স্পষ্ট। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘যে কোনো ভালো কাজের দিকনির্দেশনা দেয়, তার জন্য ওই কাজকারীর সমান সওয়াব রয়েছে।’ (মুসলিম : ১৮৯৩)। ‘তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার পরিবার-পরিজনের জন্য উত্তম। আর আমি আমার পরিবারের জন্য তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।’ (তিরমিজি : ৩৮৯৫)।

তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেককে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে।’ (বোখারি : ৮৯)। ইসলামি শিক্ষা সমাজে ইনসাফ, দয়া, মানবতা, সহযোগিতা ও সহনশীলতা শিক্ষা দেয়। আল্লাহতায়ালা বলেছেন, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ দেন ন্যায়বিচার, সদাচরণ এবং আত্মীয়দের হক।’

নারী শিক্ষার অভাব এবং পারিবারিক সম্পর্কের অবনতি:

একটি বিস্তীর্ণ ও গভীর পর্যালোচনাইসলামি জীবনদর্শনে সমাজ ও সভ্যতার মূল ভিত্তি হলো 'পরিবার'। আর একটি আদর্শ, শান্তিময় ও সুদৃঢ় পরিবার গঠনের মূল চালিকাশক্তি হলেন নারী। ইসলাম জ্ঞানার্জনকে কোনো নির্দিষ্ট লিঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং প্রতিটি মুসলিম নর-নারীর জন্য একে সমভাবে ফরজ বা বাধ্যতামূলক করেছে। বর্তমান যুগে পারিবারিক কলহ, বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক সম্পর্কের চরম অবনতির পেছনে যে কয়েকটি মৌলিক কারণ রয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম শীর্ষ কারণ হলো নারীদের ইসলামি ও নৈতিক শিক্ষার অভাব। যখন একজন নারী শরিয়তের সঠিক জ্ঞান, নিজের অধিকার, দায়িত্ব এবং ইসলামের পারিবারিক দর্শন থেকে দূরে থাকেন, তখন পুরো পারিবারিক কাঠামোটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। নিচে এই সংকটের প্রতিটি দিক কুরআন, হাদিস ও বাস্তবতার আলোকে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হলো: ১. পারিবারিক দায়িত্ব ও অধিকারের ভারসাম্যহীনতাইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার ও কর্তব্যের একটি নিখুঁত ও সুনির্দিষ্ট সীমানা নির্ধারণ করে দিয়েছে। পারিবারিক সম্পর্কের অবনতির প্রথম ধাপটি শুরু হয় তখনই, যখন অজ্ঞতার কারণে এই অধিকার ও কর্তব্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়। অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা ও তার কুফল: ইসলাম নারীকে অত্যন্ত সম্মানিত স্থান দিয়েছে। বিয়ের শুরুতেই তাকে 'মোহরানা' ও সম্পূর্ণ 'ভরণপোষণ' (নফকা)-এর একক অধিকার দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে অত্যন্ত কড়া ভাষায় নির্দেশ দিয়েছেন: "আর তোমরা নারীদেরকে তাদের মোহর খুশি মনে দিয়ে দাও।" (সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৪) ইসলামি শিক্ষার অভাবে অনেক নারী জানেনই না যে, মোহরানা তার একান্ত নিজস্ব সম্পদ এবং এটি মাফ করার অধিকার স্বামীর নেই। একইভাবে, শ্বশুরবাড়িতে নিজের শরিয়তসম্মত অধিকার ও সীমানা না জানার কারণে অনেক নারী অযথা জুলুমের শিকার হন, যা একসময় তাদের মনে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দেয়। এই মানসিক দূরত্ব কালক্রমে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্কের চিরতরে ইতি ঘটায়। কর্তব্য পালনে অবহেলা ও দাম্পত্য কলহ: বিপরীতভাবে, একজন স্ত্রীর ওপর তার স্বামীর প্রতি এবং ঘরের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে। আল্লাহর রাসূল (সা.) একটি দীর্ঘ হাদিসে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন: "নারী হলো তার স্বামীর ঘর

ও সন্তানের অভিভাবক বা দায়িত্বশীল এবং সে তার অধীনস্থদের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার বিষয়ে (কিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসিত হবে।" (সহীহ বুখারী, হাদিস নং: ২৫৫৪)যে নারী ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত নন, তিনি এই 'জিজ্ঞাসাবাদ' বা জবাবদিহিতার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেন না। স্বামীর প্রতি আনুগত্য, তার অনুপস্থিতিতে নিজের সতীত্ব ও স্বামীর সম্পদের হেফাজত করার যে নির্দেশ ইসলাম দিয়েছে, তা উপেক্ষিত হয়। ফলে ঘরে পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ এবং প্রতিনিয়ত ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে, যা শেষ পর্যন্ত আদালত বা ডিভোর্স পর্যন্ত গড়ায়।

২. আদর্শ সন্তান গঠনে ব্যর্থতা ও প্রজন্মের দূরত্বএকটি পরিবার শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নাম নয়, বরং সেখানে সন্তানরাই ভবিষ্যৎ বংশধর। সন্তানের প্রথম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী পাঠশালা হলো তার মায়ের কোল। ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়নের সেই বিখ্যাত উক্তি—"আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেবো"—ইসলাম বহু শতাব্দী আগেই বাস্তবায়ন করেছে। নৈতিক ও দ্বীনি শিক্ষার অনুপস্থিতি: মা যদি নিজে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষায় শিক্ষিত না হন, তবে তিনি সন্তানকে কীভাবে দ্বীনি মূল্যবোধ শেখাবেন? আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক পরিবার প্রধান ও মা-বাবাকে সতর্ক করে বলেছেন:"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে রক্ষা করো আগুন (জাহান্নাম) থেকে, যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর।" (সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬) ইসলামি শিক্ষার অভাবে মায়েরা সন্তানদের কেবল বস্তুগত বা পার্থিব সফলতার (যেমন: ভালো চাকরি, টাকা-পয়সা) পেছনে ছুটতে শেখান, কিন্তু তাদের ভেতরের 'মানুষ' বা 'মুসলিম' সত্তাকে জাগ্রত করতে পারেন না। সন্তানরা হালাল-হারামের পার্থক্য বোঝে না, ফলে তারা মিথ্যা, প্রতারণা ও অনৈতিকতায় জড়িয়ে পড়ে। পারিবারিক অবাধ্যতা ও মা-বাবার অবমাননা: ইসলামে মা-বাবার প্রতি যে সর্বোচ্চ সম্মান ও ইহসানের (সদাচরণ) নির্দেশ দেওয়া হয়েছে (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত: ২৩-২৪), তা মায়েরা সন্তানদের ছোটবেলা থেকে শেখাতে পারেন না। ফলস্বরূপ, সন্তানরা যখন বড় হয়, তখন তারা মা-বাবার সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠুর আচরণ করে। বৃদ্ধ বয়সে মা-বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানো বা পরিবারে তাদের বোঝা মনে করার মতো হৃদয়বিদারক ঘটনাগুলো এই শিক্ষার অভাবেরই প্রত্যক্ষ ফল।

৩. ধৈর্য, সন্তুষ্টি (কানায়াত) ও সহনশীলতার অভাবসংসার জীবন একটি দীর্ঘ সফর, যেখানে সুখের পাশাপাশি দুঃখ, দারিদ্র্য, অসুস্থতা ও বিভিন্ন পরীক্ষা আসা অত্যন্ত

স্বাভাবিক। ইসলাম মানুষকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধৈর্য (সবর) ধারণ এবং অল্পে সন্তুষ্ট থাকার (কানায়াত) সুমহান শিক্ষা দেয়। অতিরিক্ত বৈষয়িক চাহিদা ও মানসিক চাপ: বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের অপব্যবহার এবং ইসলামি শিক্ষার দূরত্বের কারণে নারীদের মধ্যে অতি-ভোক্তাবাদ ও বস্তুবাদের মরণব্যাদি ছড়িয়ে পড়ছে। অন্যের বিলাসবহুল জীবনযাত্রা দেখে নিজের স্বামীর সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে দামি পোশাক, গহনা বা আলিশান ফ্ল্যাটের আবাস্তব দাবি করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ (সা.) এই মানসিকতার কঠোর নিন্দা করে বলেছেন: "তোমরা পার্থিব বিষয়ে সর্বদা তোমাদের চেয়ে নিম্ন মর্যাদার অধিকারীদের দিকে তাকাও (যারা অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে আছে), তোমাদের চেয়ে উচ্চ মর্যাদার অধিকারীদের দিকে তাকাইও না। এটা আল্লাহর নেয়ামতকে অবজ্ঞা না করার জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত।" (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং: ২৯৬৩) এই সন্তুষ্টির অভাবের কারণে পরিবারে প্রতিদিন অশান্তি হয়। স্বামী যদি সৎ উপায়ে আয় করেন, তবে স্ত্রীর অতিরিক্ত চাহিদা মেটাতে পারেন না; আর স্ত্রীর চাপে যদি অসৎ পথ (ঘুষ, দুর্নীতি) বেছে নেন, তবে পুরো পরিবারের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষমা ও সহনশীলতার বিলুপ্তি: ইসলামি অনুশাসন মানুষকে একে অপরের ভুলত্রুটি ক্ষমা করতে শেখায়। সঠিক শিক্ষার অভাবে নারীদের মধ্যে সহনশীলতা কমে যায়। ছোটখাটো পারিবারিক ভুল বা শ্বশুরবাড়ির মানুষের কোনো কথায় দ্রুত ক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া এবং দীর্ঘ সময় রাগ বা জিদ ধরে রাখার কারণে দাম্পত্য জীবনের মধুরতা বিষাদে পরিণত হয়।

৪. কুসংস্কার, গীবত ও সামাজিক কুপ্রথার বিস্তার ইসলামি নারী শিক্ষার একটি বড় উদ্দেশ্য হলো মন ও মনস্তত্ত্বের আত্মশুদ্ধি (তাজকিয়াহ)। যখন এই শুদ্ধি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়, তখন পরিবারে বিভিন্ন কবিরী গুনাহ ও সামাজিক ব্যাদি বাসা বাঁধে, যা সম্পর্কগুলোকে ভেতর থেকে উইপোকাকার মতো খেয়ে ফেলে। গীবত ও চোগলখুরি (পরনিন্দা ও পরচর্চা): এটি বর্তমান পারিবারিক জীবনের সবচেয়ে বড় ক্যানসার। শাশুড়ি, ননদ বা পুত্রবধূর মধ্যে পারস্পরিক দোষ খোঁজা এবং তা অন্যের কাছে বলে বেড়ানো সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অথচ আল্লাহ তাআলা একে কতটা জঘন্য বলেছেন দেখুন: "তোমাদের কেউ যেন কারও গীবত (পরনিন্দা) না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তা অপছন্দই করো।" (সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১২) দ্বীনি শিক্ষার অভাবে নারীরা বুঝতে পারেন না যে, তাদের মুখের একটি কথাই একটি সুন্দর সংসারকে ধ্বংস

করে দিতে পারে। চোগলখুরির কারণে ভাই-ভাই, মা-ছেলে এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী দেয়াল তৈরি হয়। কুসংস্কার ও শিরক-বেদাত: দ্বীনি জ্ঞানহীন পরিবারগুলোতে সামান্য অসুখ বা পারিবারিক সমস্যায় বিভিন্ন কবিরাজ, তান্ত্রিক, জাদুটোনা বা কুসংস্কারে আশ্রয় নেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন অমুক মানুষের নজর লাগার কারণে বা অমুকের কুদৃষ্টির কারণে সংসারে অশান্তি হচ্ছে। এই অমূলক সন্দেহ ও কুসংস্কারের ফলে আপন আত্মীয়দের শত্রু ভাবা শুরু হয় এবং পারিবারিক বন্ধন চিরতরে ছিন্ন হয়ে যায়।

নৈতিক শিক্ষার অভাব

১. সন্তানদের নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষাদানে অবহেলা

ইসলামে মাকে সন্তানের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। শিশু তার জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা, আচার-আচরণ, ভাষা, মূল্যবোধ এবং নৈতিকতা মায়ের কাছ থেকেই অর্জন করে। যদি একজন মা সন্তানকে ছোটবেলা থেকে সত্যবাদিতা, শিষ্টাচার, নামাজ, কুরআন শিক্ষা, বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্মান এবং মানবিক মূল্যবোধ শিক্ষা না দেন, তাহলে সন্তান নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে বেড়ে উঠতে পারে। এর ফলে সে অবাধ্য, অসৎ ও দায়িত্বহীন হয়ে উঠতে পারে, যা পরবর্তীতে পরিবার ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর হয়। তাই একজন মায়ের নৈতিক শিক্ষাদানের অবহেলা পারিবারিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হতে পারে।

২. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি

ইসলাম দাম্পত্য জীবনকে ভালোবাসা, সহযোগিতা, সম্মান ও সহমর্মিতার ভিত্তিতে পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু নৈতিক শিক্ষার অভাবে যদি একজন স্ত্রী অহংকার, অসহিষ্ণুতা, রাগ বা অবাধ্য আচরণ করেন, তাহলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কলহ ও মতবিরোধ বৃদ্ধি পায়। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে ঝগড়া, একে অপরকে অসম্মান করা এবং ক্ষমার মনোভাব না থাকা পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে। এর ফলে সন্তানদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং কখনও কখনও বিচ্ছেদের মতো পরিস্থিতিও সৃষ্টি হতে পারে।

৩. ভোগবাদিতা ও অপচয় প্রবণতা বৃদ্ধি

নৈতিক শিক্ষার অভাবে অনেক সময় মানুষ প্রয়োজনের চেয়ে বিলাসিতাকে বেশি গুরুত্ব দেয়। পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে অতিরিক্ত পোশাক, অলংকার, সাজসজ্জা বা অন্যান্য ভোগ্যপণ্যের প্রতি আকর্ষণ পরিবারে অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করতে পারে। ইসলাম অপচয় ও অহেতুক ব্যয়কে নিরুৎসাহিত করেছে। যখন একজন নারী সংসারে মিতব্যয়িতা ও সঞ্চয়ের পরিবর্তে অপচয়কে উৎসাহিত করেন, তখন পরিবারে আর্থিক সংকট, অশান্তি এবং পারস্পরিক দোষারোপের পরিবেশ তৈরি হয়।

৪. পরনিন্দা, হিংসা ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি

পরনিন্দা (গীবত), চোগলখোরি এবং হিংসা সামাজিক ও পারিবারিক সম্পর্ক ধ্বংসের অন্যতম কারণ। নৈতিক শিক্ষার অভাবে একজন নারী যদি আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী বা পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে নেতিবাচক কথা বলেন, তাহলে সম্পর্কের মধ্যে অবিশ্বাস ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এক পরিবারের সদস্যের বিরুদ্ধে অন্য সদস্যকে উসকানি দেওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে। ইসলাম গীবত ও চোগলখোরিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে, কারণ এগুলো পারিবারিক ঐক্য বিনষ্ট করে।

৫. ইসলামী পর্দা ও শালীনতার অবহেলা

ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শালীনতা ও পর্দার বিধান দিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার অভাবে যদি একজন নারী ইসলামী শালীনতার সীমা অতিক্রম করেন এবং অনৈতিক বা অশোভন আচরণে জড়িয়ে পড়েন, তাহলে তা পরিবার ও সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শালীনতা মানুষের চরিত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং পারিবারিক মর্যাদা রক্ষা করে। পক্ষান্তরে এর অবহেলা পারিবারিক অস্থিরতা ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ হতে পারে।

৬. পারিবারিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা

ইসলামে পরিবার পরিচালনায় নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। একজন স্ত্রী ও মা হিসেবে সন্তানদের লালন-পালন, তাদের মানসিক ও নৈতিক বিকাশ এবং পরিবারের সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রাখার দায়িত্ব রয়েছে। নৈতিক শিক্ষার অভাবে যদি একজন নারী নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন, তাহলে সন্তানদের মধ্যে

শৃঙ্খলাহীনতা এবং পরিবারের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতে পারে। দায়িত্ববোধের অভাব পারিবারিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

৭. দ্বীনি পরিবেশ গঠনে অনাগ্রহ

একটি পরিবারের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দ্বীনি পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামী আলোচনা এবং আল্লাহর স্মরণ পরিবারে শান্তি ও নৈতিকতা প্রতিষ্ঠা করে। যদি একজন নারী এসব বিষয়ে উদাসীন থাকেন এবং সন্তানদেরও দ্বীনি শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত না করেন, তাহলে পরিবার ধীরে ধীরে ইসলামী মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যেতে পারে। এর ফলে নৈতিক অবক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়।

৮. আধুনিক প্রযুক্তি ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার

বর্তমান যুগে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম মানুষের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে নৈতিক শিক্ষার অভাবে যদি একজন নারী অতিরিক্ত সময় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যয় করেন এবং পরিবার, সন্তান বা স্বামীর প্রতি দায়িত্ব অবহেলা করেন, তাহলে পারিবারিক সম্পর্কে দূরত্ব সৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া অনলাইন আসক্তি, গোপনীয়তার অপব্যবহার এবং অনৈতিক যোগাযোগও পারিবারিক সমস্যার কারণ হতে পারে।

৯. আত্মকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিস্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া

নৈতিক শিক্ষা মানুষকে ত্যাগ, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার শিক্ষা দেয়। কিন্তু নৈতিক শিক্ষার অভাবে যদি একজন নারী শুধুমাত্র নিজের চাহিদা, ইচ্ছা ও স্বার্থকে প্রাধান্য দেন, তাহলে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের প্রয়োজন ও অনুভূতি উপেক্ষিত হয়। এর ফলে পরিবারে মানসিক দূরত্ব, অসন্তোষ এবং বিরোধ বৃদ্ধি পায়। একটি সুখী পরিবার গঠনের জন্য আত্মত্যাগ ও পারস্পরিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

১০. আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় উদাসীনতা

ইসলাম আত্মীয়তার সম্পর্ক (সিলাতুর রাহিম) বজায় রাখার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। নৈতিক শিক্ষার অভাবে যদি একজন নারী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করেন বা স্বামীকে তার আত্মীয়দের থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেন, তাহলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়। আত্মীয়তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়া পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণ।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী পরিবার গঠনের কেন্দ্রবিন্দু। একজন শিক্ষিত, নৈতিক ও দ্বীনদার নারী পরিবারকে জান্নাতের বাগানে পরিণত করতে পারেন। অন্যদিকে নৈতিক শিক্ষার অভাব পরিবারে অশান্তি, দ্বন্দ্ব, দায়িত্বহীনতা ও মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করতে পারে। তবে পারিবারিক অবক্ষয়ের দায় শুধু নারীর নয়; বরং নারী-পুরুষ উভয়ের নৈতিকতা, তাকওয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই একটি আদর্শ পরিবার গড়ে ওঠে।

নারী শিক্ষার অভাবে পারিবারিক প্রভাব

দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি

দাম্পত্য জীবন মানবজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সম্পর্ক, যা ভালোবাসা, বিশ্বাস, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে শান্তি, সহমর্মিতা ও ভালোবাসার বন্ধন হিসেবে বর্ণনা করেছে। কিন্তু পারস্পরিক বোঝাপড়ার অভাব, অসচেতনতা, রাগ, অহংকার, অবিশ্বাস এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ঘাটতির কারণে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এই ভুল বোঝাবুঝি ধীরে ধীরে পারিবারিক অশান্তি, সম্পর্কের দূরত্ব এবং কখনও কখনও বিচ্ছেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

Quran-এ মহান আল্লাহ বলেন—

“আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং তিনি তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।”

(সূরা আর-রুম: ২১)

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে দাম্পত্য জীবনের মূল ভিত্তি হলো ভালোবাসা, দয়া ও শান্তি। কিন্তু যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যোগাযোগের অভাব ও ভুল ধারণা তৈরি হয়, তখন সেই শান্তি নষ্ট হয়ে যায়।

দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির অন্যতম কারণ হলো একে অপরের প্রতি যথাযথ সম্মান ও ধৈর্যের অভাব। ছোটখাটো বিষয় নিয়ে সন্দেহ, রাগ বা নেতিবাচক মনোভাব

অনেক সময় বড় সমস্যার সৃষ্টি করে। ইসলাম ধৈর্য, সহনশীলতা ও ক্ষমাশীলতার শিক্ষা দিয়েছে যাতে পারিবারিক সম্পর্ক সুন্দর ও স্থিতিশীল থাকে।

Prophet Muhammad বলেছেন—

“তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম।”

(তিরমিজি)

এই হাদিস স্বামীদের প্রতি স্ত্রীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দেয়। একইভাবে স্ত্রীদেরও স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দায়িত্বশীল হওয়ার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যখন উভয়েই ইসলামী আদর্শ অনুযায়ী আচরণ করে, তখন ভুল বোঝাবুঝি অনেকাংশে কমে যায়।

বর্তমান সমাজে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির আরও কিছু কারণ দেখা যায়।

যেমন—

- পারস্পরিক যোগাযোগের অভাব
- অতিরিক্ত সন্দেহ ও অবিশ্বাস
- রাগ ও অহংকার
- একে অপরকে সময় না দেওয়া
- পারিবারিক ও সামাজিক চাপ
- ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার অভাব
- সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব

এসব কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং সম্পর্ক দুর্বল হয়ে পড়ে।

দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির ফলে পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়, সন্তানদের মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় এর প্রভাব পুরো সমাজের ওপরও পড়ে। তাই পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে পারস্পরিক বোঝাপড়া, ভালোবাসা ও সহমর্মিতা অত্যন্ত প্রয়োজন।

ইসলাম দাম্পত্য জীবনে পরামর্শ, ধৈর্য ও সুন্দর আচরণের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে।

স্বামী-স্ত্রীকে একে অপরের ভুল ক্ষমা করা, খোলামেলা আলোচনা করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। একজনের প্রতি অন্যজনের দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করলে ভুল বোঝাবুঝি অনেকাংশে দূর করা সম্ভব।

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক বোঝাপড়া ও বিশ্বাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একটি সুখী পরিবার গড়ে ওঠে যখন উভয়ে একে অপরের অনুভূতি, মতামত ও প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেয়। কিন্তু যখন যোগাযোগের ঘাটতি, ভুল ধারণা বা পারস্পরিক অবহেলা সৃষ্টি হয়, তখন ধীরে ধীরে সম্পর্কের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়। ছোট ছোট মতবিরোধও বড় ধরনের ভুল বোঝাবুঝিতে রূপ নিতে পারে, যা পারিবারিক শান্তি নষ্ট করে দেয়। ইসলাম দাম্পত্য সম্পর্ককে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার সম্পর্ক হিসেবে বর্ণনা করেছে। Quran-এ মহান আল্লাহ বলেন—

“তারা তোমাদের জন্য পোশাক এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাক।”

(সূরা আল-বাকারাহ: ১৮৭)

এই আয়াতের মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর ঘনিষ্ঠতা, নিরাপত্তা, ভালোবাসা ও পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। যেমন পোশাক মানুষকে আচ্ছাদিত ও সুরক্ষিত রাখে, তেমনি স্বামী-স্ত্রীও একে অপরের দুর্বলতা গোপন করে এবং মানসিক শান্তি প্রদান করে। কিন্তু যখন পারস্পরিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা হয়, তখন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

দাম্পত্য জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা, পারিবারিক হস্তক্ষেপ, অতিরিক্ত প্রত্যাশা এবং মানসিক অস্থিরতাও ভুল বোঝাবুঝির কারণ হতে পারে। অনেক সময় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কথা মনোযোগ দিয়ে না শুনে তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেয়, যা সম্পর্কের মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করে। ইসলাম ধৈর্য ও সুন্দর ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের শিক্ষা দিয়েছে।

Prophet Muhammad বলেছেন—

“মুমিনদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র উত্তম এবং তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ করে।”

(তিরমিজি) এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে উত্তম চরিত্র ও সুন্দর আচরণ দাম্পত্য জীবনের শান্তি রক্ষার অন্যতম উপায়। একজন স্বামী ও স্ত্রীর উচিত একে অপরের প্রতি নম্রতা, ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করা।

দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝির কারণে শুধু স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না; বরং সন্তানদের মানসিক বিকাশের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। পরিবারে অশান্ত পরিবেশ থাকলে শিশুরা মানসিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের মধ্যে ভয়, উদ্বেগ

ও অসামাজিক আচরণ তৈরি হতে পারে। তাই পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য দাম্পত্য সম্পর্কের সুস্থতা অত্যন্ত জরুরি।

ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য ইসলাম কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। যেমন—

- ধৈর্য ধারণ করা
- রাগ নিয়ন্ত্রণ করা
- পারস্পরিক আলোচনা করা
- ক্ষমাশীল হওয়া
- একে অপরের অধিকার আদায় করা
- গোপনীয়তা রক্ষা করা
- আল্লাহর ভয় ও ধর্মীয় মূল্যবোধ মেনে চলা

এসব গুণ দাম্পত্য জীবনে শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে।

বর্তমান সমাজে প্রযুক্তির অপব্যবহার, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অতিরিক্ত আসক্তি এবং পারিবারিক সময়ের অভাবও দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ইসলামী মূল্যবোধ ও নৈতিক শিক্ষার আলোকে পারিবারিক জীবন পরিচালনা করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি একটি সাধারণ সমস্যা হলেও সঠিক বোঝাপড়া, ধৈর্য, ভালোবাসা ও ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে তা সমাধান করা সম্ভব। একটি সুখী ও শান্তিপূর্ণ পরিবার গঠনের জন্য স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ ও আন্তরিকতা অপরিহার্য।

স্বামীস্ত্রী কলহ

নারীশিক্ষার অভাব একটি দাম্পত্য সম্পর্কের ভিতকে দুর্বল করে দিতে পারে, যার ফলে স্বামী-স্ত্রীর বোঝাপড়ায় বড় ধরনের অবনতি ঘটে। আধুনিক সমাজে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমতা সম্পর্কের মূলভিত্তি হলেও, শিক্ষার অভাবে এই সমতা ব্যাহত হয়। নারীশিক্ষার অভাবে সম্পর্কের অবনতির মূল কারণসমূহ:

যোগাযোগের অভাব: শিক্ষিত স্ত্রী তার মত বা চাহিদাগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে পারেন, যা অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত নারীদের ক্ষেত্রে কঠিন হতে পারে। এর ফলে স্বামীর সাথে ভুল বোঝাবুঝি বা মনের দূরত্ব তৈরি হয়।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে অসমতা: উচ্চশিক্ষিত নারীরা সাধারণত নিজেদের মতামত ও সিদ্ধান্তের ওপর আত্মবিশ্বাসী হন, যা যৌথ পরিবার বা দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার অভাবে নারী প্রায়শই স্বামীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট করে।

মানসিক দূরত্বের সৃষ্টি: স্বামী উচ্চশিক্ষিত এবং স্ত্রী অশিক্ষিত হলে মানসিকতার ভিন্নতার কারণে দীর্ঘমেয়াদে সম্পর্কে ফাটল ধরতে পারে। পারস্পরিক আলোচনার বিষয়ের অভাব বা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সম্পর্ক যান্ত্রিক হয়ে পড়ে।

আর্থিক নির্ভরশীলতা ও শোষণের ঝুঁকি: নারীশিক্ষার অভাবে স্ত্রীরা স্বামীর ওপর আর্থিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, যা অনেক সময় স্বামী কর্তৃক মানসিকভাবে বা সামাজিকভাবে হেয় প্রতিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি বাড়ায়।

সন্তান লালন-পালন ও সচেতনতার অভাব: শিক্ষিত মা সন্তানের স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানসিক বিকাশে বেশি সচেতন থাকেন। শিক্ষার অভাবে সচেতনতার অভাবে সংসারে বিশৃঙ্খলা বা সন্তানের লালন-পালন নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি হতে পারে।

পারস্পরিক ‘সদ্ভাব’ বা সুন্দর আচরণের ঘাটতিপবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা স্বামীদের নির্দেশ দিয়েছেন, “এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে সদ্ভাবে (সুন্দর ও মর্যাদাপূর্ণ উপায়ে) বসবাস করো।” (সূরা নিসা: ১৯)।

যুক্তির অভাব: একজন নারী ইসলামিক অধিকার ও শালীনতার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলে তিনি স্বামীর মেজাজ, পছন্দ-অপছন্দ বা পারিবারিক সংবেদনশীলতা অনুধাবন করতে ব্যর্থ হতে পারেন। অহেতুক সন্দেহ ও কলহ: শিক্ষার অভাব অনেক সময় সংকীর্ণ মানসিকতা বা অহেতুক সন্দেহের জন্ম দেয়। এর ফলে ঘরে নিত্যদিন ঝগড়া-বিবাদ লেগে থাকে, যা কুরআনের 'সদ্ভাবে বসবাসের' নির্দেশের পরিপন্থী। ২. সুস্নাহভিত্তিক বোঝাপড়া ও পরিপূরকতার অভাব ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী ও স্ত্রী একে অপরের পরিপূরক এবং পোশাকস্বরূপ। মহান আল্লাহ বলেন, “তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।” (সূরা বাকারা: ১৮৭)। মানসিক দূরত্ব: স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে দ্বিনি ও মানসিক শিক্ষার স্তরে বড় ব্যবধান থাকলে এই 'পোশাক' বা আবরণের ভূমিকা ব্যাহত হয়। একাকীত্ব: স্বামী যদি উচ্চশিক্ষিত ও মার্জিত হন আর স্ত্রী যদি ইসলামের সাধারণ শিষ্টাচার ও বৈষয়িক জ্ঞান থেকে দূরে থাকেন, তবে তাদের মধ্যে চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান থমকে যায়। ফলে তারা একই ছাদের নিচে থেকেও একাকীত্ব অনুভব করেন।

৩. আদর্শ ‘মুসলিম মা’ হিসেবে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতাইসলামে একটি সুন্দর সমাজ ও আদর্শ প্রজন্ম গঠনের মূল দায়িত্ব মায়ের ওপর ন্যস্ত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, “নারী তার স্বামীর ঘর এবং সন্তানের অভিভাবক, সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।” (সহীহ বুখারী)। সন্তানের ভুল লালন-পালন: মা যদি নিজেই দ্বীন, নৈতিকতা এবং সমসাময়িক বিষয়ে শিক্ষিত না হন, তবে তিনি সন্তানদের আদর্শ মুসলিম হিসেবে গড়ে তুলতে পারেন না। দাম্পত্য কলহ: সন্তান অবাধ্য বা অনৈতিক পথে পা বাড়ালে স্বামী এর জন্য স্ত্রীর অজ্ঞতাকে দায়ী করেন, যা দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক দোষারোপ (Blame-game) এবং তীব্র মানসিক তিক্ততা সৃষ্টি করে। ৪. অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে অজ্ঞতাইসলামে স্বামী এবং স্ত্রী উভয়েরই নির্দিষ্ট কিছু স্বত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। শিক্ষার অভাবে নারীরা প্রায়শই তাদের প্রকৃত ইসলামিক অধিকার যেমন—মোহরানা, ভরণপোষণ এবং সম্মানজনক আচরণের সঠিক জ্ঞান লাভ করেন না। শোষণের শিকার হওয়া: অজ্ঞতার কারণে অনেক নারী স্বামীর অন্যায় শাসন বা জুলুম মুখ বুজে সহ্য করেন, যা সম্পর্কে একসময় তীব্র ক্ষোভ ও বিষাদ নিয়ে আসে। কর্তব্যে অবহেলা: একইভাবে, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কী দায়িত্ব (যেমন: আনুগত্য, আমানত রক্ষা), সে বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে স্ত্রী নিজের অজান্তেই অবাধ্যতা করে ফেলতে পারেন, যা সম্পর্ককে তালাকের দিকে ঠেলে দেয়। ৫. কুসংস্কার এবং

শিরকের প্রভাবদ্বীনি শিক্ষার আলো না থাকলে গ্রামীণ বা পারিবারিক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার সহজে একজন নারীকে গ্রাস করে। ভুল সমাধান খোঁজা: সংসারে বরকত আনা, স্বামীর মন জয় করা বা রোগমুক্তির জন্য অনেকে ইসলামের নিষিদ্ধ পথ যেমন—জাদু-টোনা, কবিরাজি, তাবিজ-কবজ বা মাজার পূজার আশ্রয় নেন। ঈমানী ও দাম্পত্য ফাটল: একজন ঈমানদার ও তাওহীদী আদর্শের স্বামী কখনোই স্ত্রীর এই শিরকপূর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচরণ মেনে নিতে পারেন না। এটি তাদের মধ্যে মানসিক ও ধর্মীয় দূরত্বের এক বড় দেয়াল খাড়া করে।

ইসলামিক সমাধান: ইসলামের প্রথম যুগের বিদুষী নারী, যেমন হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন একাধারে কোরআন, হাদিস, ফিকহ এবং চিকিৎসার জ্ঞানে পণ্ডিত। ইসলাম বলে, বিয়ের পরেও স্বামীকে স্ত্রীর শিক্ষার (বিশেষ করে দ্বীনি এবং জরুরি বৈষয়িক শিক্ষার) ব্যবস্থা করতে হবে। স্ত্রী যখন শিক্ষিত ও সচেতন হবেন, তখন তিনি স্বামীকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখতে পারবেন, যার ফলে দাম্পত্য জীবন সুখের ও জান্নাতমুখী হবে।

সন্তানের নৈতিক অবক্ষয়

একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক। শিশুর চরিত্র, আচরণ ও নৈতিকতা গঠনে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। একজন শিক্ষিত ও সচেতন মা সন্তানকে ধর্মীয় শিক্ষা, নৈতিকতা ও সামাজিক মূল্যবোধ শেখাতে সক্ষম হন। কিন্তু নারী শিক্ষার অভাবে সন্তানরা সঠিক দিকনির্দেশনা থেকে বঞ্চিত হতে পারে।

বর্তমান সমাজে কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, বেয়াদবি ও নৈতিক অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ পারিবারিক শিক্ষার দুর্বলতা। মায়ের মধ্যে যদি ইসলামী জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষার অভাব থাকে, তবে তার প্রভাব সন্তানের ওপর পড়ে। ফলে সন্তানরা ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতা থেকে দূরে সরে যেতে পারে।

নারী শিক্ষার অভাব কীভাবে সন্তানের নৈতিক অবক্ষয় ঘটায়, সেটির বিস্তারিত বিশ্লেষণ নিচে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট পয়েন্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো: ১. প্রথম পাঠশালার দুর্বল ভিত্তি প্রথম শিক্ষক: একটি শিশুর জীবনের প্রথম এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী শিক্ষক হলেন তার মা।

অনুকরণ প্রিয়তা: শিশুরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আগে মায়ের ভাষা, আচরণ এবং দৃষ্টিভঙ্গি অনুকরণ করে।

ভিত্তি দুর্বলতা: মা নিজে শিক্ষা ও সঠিক মূল্যবোধ থেকে বঞ্চিত হলে, শিশুর প্রাথমিক নৈতিক ভিত্তিটিই দুর্বল থেকে যায়।

২. কুসংস্কার এবং সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিঅন্ধবিশ্বাস: শিক্ষার অভাবে নারীদের মধ্যে অনেক সময় কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস বাসা বাঁধে। চিন্তার সীমাবদ্ধতা: সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা সন্তানকে আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক এবং উদারনৈতিক চিন্তা শেখাতে পারেন না। ফলে সন্তানরা বাস্তবসম্মত ও যুক্তিনিষ্ঠ নৈতিকতার বদলে কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয়ে বড় হয়।

৩. ভালো ও মন্দের পার্থক্য বোঝানোর অক্ষমতাসঠিক গাইডলাইন: বর্তমান যুগের জটিল সামাজিক পরিস্থিতিতে কোনটি ভালো আর কোনটি মন্দ, তা সন্তানকে বোঝানো কঠিন। সচেতনতার অভাব: একজন অশিক্ষিত মা প্রযুক্তির অপব্যবহার (যেমন: ক্ষতিকর ইন্টারনেট কন্টেন্ট) বা অসৎ সঙ্গে কুফল সম্পর্কে আগে থেকে আঁচ করতে পারেন না। তদারকির অভাব: সঠিক গাইডলাইনের অভাবে সন্তানরা খুব সহজেই নৈতিকভাবে বিপথগামী হয়ে পড়ে।

৪. আবেগীয় ও মানসিক বিকাশের ঘাটতিমনস্তত্ত্ব না বোঝা: শিক্ষিত মায়েরা শিশুর মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের রাগ, অভিমান বা জেদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আচরণগত সমস্যা: শিক্ষার অভাবে মায়েরা অনেক সময় সন্তানের সাথে অতিরিক্ত কঠোরতা বা অতিরিক্ত আদরের ভুল আচরণ করেন। হতাশা ও অপরাধ: এই ভারসাম্যহীন লালন-পালনের ফলে সন্তানের মধ্যে একাকীত্ব, হতাশা বা আত্মসী ভাব তৈরি হয়, যা পরবর্তীতে তাদের অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

৫. অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতা ও পারিবারিক অশান্তিপারিবারিক কলহ: শিক্ষিত না হওয়ায় নারীরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন না এবং পরিবারে নিজেদের অধিকার আদায় করতে পারেন না। মানসিক চাপ: প্রতিনিয়ত পারিবারিক কলহ ও অশান্তির মধ্যে বড় হওয়া শিশুরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে। সহিংস আচরণ: এই মানসিক চাপ তাদের মধ্যে সহমর্মিতা ও ধৈর্যের মতো নৈতিক গুণাবলি নষ্ট করে সহিংস করে তোলে।

৬. সামাজিক ও নাগরিক দায়িত্ববোধের অভাবঅধিকার ও কর্তব্য: শিক্ষা মানুষকে তার নাগরিক অধিকার ও সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। আইন অমান্য

করা: মা নিজে এ বিষয়ে অসচেতন হলে সন্তানকে সমাজ, আইন এবং অন্যের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শেখাতে পারেন না। উচ্ছৃঙ্খলতা: এর ফলে সন্তানদের মধ্যে আইন অমান্য করা এবং সামাজিক নিয়ম ভাঙার প্রবণতা দেখা দেয়।

৭. লক্ষ্যহীন জীবন ও হতাশাস্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থতা: একজন শিক্ষিত মা সন্তানের মনে বড় হওয়ার স্বপ্ন এবং লক্ষ্য বুনে দিতে পারেন। উচ্ছৃঙ্খল জীবন: মায়ের কাছ থেকে সঠিক অনুপ্রেরণা না পেয়ে অনেক সন্তান জীবনকে লক্ষ্যহীন মনে করে এবং মাদকের মতো মারাত্মক নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হয়।

প্রতিকার ও সমাধান

নারী শিক্ষার গুরুত্ব ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

একটা সমাজ সংশোধনে শিক্ষিত নারীদের অবদান অনস্বীকার্য। এরা যে দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন করতে পারবে, এটা অনেক ক্ষেত্রে পুরুষদের পক্ষেও সম্ভব হবে না। এদের শিক্ষা-দীক্ষা অর্জনের সুযোগ না হলে হালাল-হারামের বাছ-বিচার করবে না, আল্লাহ ও রাসুলের মর্যাদাকে অনুধাবন করবে না। বিভিন্ন অনৈতিকতা, কুফরি-শিরক ইত্যাদিতে লিপ্ত হয়ে পড়বে। তাদের কারণে হয়তো সমাজে কোনো বিশৃঙ্খলা তৈরি হতে পারে।

নারীদের শিক্ষা-দীক্ষা জরুরি, যেন তাদের ইসলামের সর্বজনীন বিধানগুলো বুঝতে সহজ হয়। রাসুলের মুখনিঃসৃত বাণীগুলো জানতে পারে। নিজের প্রতিবেশীদের মধ্যে দাওয়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে। নিজের বৈবাহিক ও পারিবারিক জীবনকে সুন্দর করতে পারে। সন্তানদের সুশিক্ষা দিতে পারে। মা শিক্ষিত ও শিষ্টাচারবান হলে পরিবারের অন্ধকার ও মূর্খতা এমনিতেই চলে যাবে। আদর্শ সমাজ গঠন হবে। সন্তানদের জীবনে এগুলোর প্রতিফল ঘটবে।

কেননা, ‘আমাকে শিক্ষিত মা দাও, আমি শিক্ষিত জাতি দিব’ -নেপোলিয়ান বোনাপার্ট এর এই চিরস্মরণীয় উক্তিটি আমাদের সবার জানা। একজন শিক্ষিত নারী একটি পরিবারকে শিক্ষিত করতে পারে। এ জন্য আরবিতে একটি প্রবাদ আছে,

‘একজন পুরুষ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া মানে একজন ব্যক্তিকে শিক্ষিত করে তোলা, আর একজন মেয়েকে শিক্ষা দেওয়া মানে একটি গোটা পরিবারকে শিক্ষিত করে তোলা।’ পৃথিবীর অর্ধেক জনসমষ্টি নারী। তাই মানব জাতির সামগ্রিক কল্যাণের কথা মাথায় রেখে বলা যায়, নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

নারী শিক্ষার গুরুত্ব বর্ণনাতীত। কেননা নারী মানব জাতির অর্ধেক অংশ। জনসমষ্টির অর্ধেককে শিক্ষার বাইরে রেখে সমাজের পক্ষে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এই অর্ধেক জনগণকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি ও কল্যাণ আসতে পারে না। যুগের পরিক্রমায় নারী শিক্ষার গুরুত্ব বর্তমানে অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। নারীর অবস্থান সমাজে চিরকাল ধরেই অবহেলিত এবং পশ্চাদপদ। নারীর এই অবস্থান থেকে উত্তরণের জন্য শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শিক্ষা অর্জন করে নারী তার নিজের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হবে, স্বাস্থ্য সচেতন হবে। তাই নারীর উন্নয়নের জন্য প্রাথমিক উপাদান হলো নারী শিক্ষা।

নারীকে স্বাবলম্বী হতে হলে কর্মসংস্থানের প্রয়োজন। কেননা কর্মসংস্থানই নারীর আর্থিক নিরাপত্তা দিতে পারে। নারীর জন্য যুগোপযোগী কর্মসংস্থানের জন্য শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। বর্তমান সময়ে সরকার নারীর জন্য কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে যা শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে নারীর কর্মে প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে ৬০% নারী শিক্ষক নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। যা নারীর কর্মসংস্থানের একটি বিরাট সুযোগ।

একটি পরিবারের সুরক্ষায় একজন শিক্ষিত নারী একটি সুরক্ষিত দুর্গের মতো কাজ করে। কারণ একজন সুশিক্ষিত নারী স্বাস্থ্য সচেতন। আর একজন স্বাস্থ্য সচেতন মা, স্ত্রী বা বোন তার সন্তান, স্বামী বা ভাই-বোনকে সব সময় সুরক্ষিত রাখতে সচেষ্ট থাকেন। আবার একজন শিক্ষিত মা সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেন এবং সে অনুযায়ী সন্তানকে চালিত করেন। সন্তানের চলাফেরা, নিয়মানুবর্তীতাসহ যাবতীয় বিষয় খেয়াল করেন। ফলে সন্তান মানুষের মতো মানুষ হতে পারে। একজন সুশিক্ষিত নারী সুরক্ষিত পরিবারের জন্য খুবই প্রয়োজন। সন্তানের শিক্ষার জন্য নারী শিক্ষা: সন্তান জন্মের পর থেকে মায়ের সংস্পর্শেই বেশির ভাগ সময় থাকে। মায়ের আচার-আচরণ, চাল-চলন, কথাবার্তা সব কিছুই সন্তানকে প্রভাবিত করে। মায়ের হাতে সন্তানের শিক্ষার হাতে খড়ি। মা যদি শিক্ষিত হন

তাহলে সন্তান অবশ্যই শিক্ষিত হবে। একজন নারী শিক্ষিত হওয়ার অর্থ ওই পরিবারের পরবর্তী প্রজন্ম শিক্ষিত হবে।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই বিশাল জনসমষ্টিতে শিক্ষার মাধ্যমে সম্পদে পরিণত করে দেশকে এগিয়ে নেওয়া বর্তমানে সময়ের দাবী। নারীকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করলে দেশ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এজন্য বাংলাদেশ সরকার নারী শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

মানুষ জ্ঞানী বা শিক্ষিত হয়ে জড়গ্রহণ করে না। মানুষকে জ্ঞান অর্জন করতে হয়। এ জন্য হাদিসে বলা হয়েছে ‘জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ।’

ইসলামে পুরুষের মতো নারীর জন্যও শিক্ষা লাভ করা ফরজ করা হয়েছে। যেখানে পুরুষের শিক্ষার প্রসঙ্গে এসেছে সেখানে নারীদের শিক্ষার কথাও বলা হয়েছে। নবী করিম (স.) এর সহধর্মিণী হযরত আয়েশা (রা.) ছিলেন তৎকালীন সময়ে সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত নারী। বিয়ে করার সময় মেয়ের শিক্ষার দিকে নজর দেওয়ার জন্য রাসূল (স.) নির্দেশ দিয়েছেন।

যেকোনো সমাজকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির দিকে এগিয়ে নিতে হলে নারী ও পুরুষ উভয়কেই তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। নারী শিক্ষাই পারে সমাজের সকল স্তরের নারীদেরকে তাদের সামাজিক অধিকার ও করণীয় সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে।

নারী শিক্ষার প্রসারে বাধাসমূহ: নারী শিক্ষার বিষয়টি এখনও আমাদের সমাজে বেশ কন্ট্রাকারী। এ ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধকতাগুলো নিম্নরূপ-

সচেতনতার অভাব: নারী শিক্ষার প্রসারে প্রধান অন্তরায় হলো গণসচেতনতার অভাব। নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষ এখনো অসচেতন।

বাল্য বিবাহ: মেয়েদেরকে অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের গন্ডি পেরানোর আগেই বাবা-মা মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করেন ফলে এক মেয়ের পক্ষে কাঙ্ক্ষিত শিক্ষা অর্জন করা সম্ভব হয় না।

ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে নারীকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখা হচ্ছে। নারী ঘরে থাকার জন্য বা নারী ঘরের বাইরে গেলে পাপ এসব কথা বলে মেয়েকে বিদ্যা অর্জন থেকে বিরত রাখা হয়। মেয়েদের প্রতি নীচু ধারণা: মেয়েরা ছেলেদের থেকে দুর্বল, কম মেধাবী মেয়েদের সম্পর্কে এ ধরনের ধারণা নারী শিক্ষার জন্য বাধা।

নারী শিক্ষার প্রসারে আমাদের করণীয়: নারী শিক্ষার প্রসারে আমাদের করণীয় সমূহ
নিম্নরূপ-

সচেতনতা বৃদ্ধি: নারী শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে জনসাধারণের মধ্যে প্রচারণা চালাতে হবে। নারীকে শিক্ষিত করে তুললে কী ধরনের লাভ হবে আর না করলে কী ক্ষতি হবে তা সবাইকে বুঝাতে হবে।

মানসিকতার পরিবর্তন: নারী শিক্ষার প্রসারে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন দরকার। নারীকে পুরুষের থেকে উত্তম মনে করে নারী বা মেয়েদেরকে অবহেলা করার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

ধর্মীয় নেতাদের এগিয়ে আসা দরকার: শিক্ষা ক্ষেত্রে নারীদের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ হলো ধর্মীয় গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামি দূর করার জন্য ধর্মীয় নেতাদের এগিয়ে আসতে হবে। কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয়। মেয়ে ছেলে বৈষম্য হ্রাস: শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষ বা ছেলেমেয়ের মধ্যে কোনো ধরনের বৈষম্য করা উচিত নয়। ছেলে হোক মেয়ে হোক সব সন্তানকে শিক্ষিত করার জন্য বাবা-মাকে এগিয়ে আসতে হবে।

একটি সমাজের সার্বিক অগ্রগতির জন্য নারী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। নারী শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে প্রচলিত ধ্যান ধারণা ও মানসিকতা সবচেয়ে বড় বাধা। প্রত্যন্ত গ্রাম ও মফস্বল থেকে যে সব মেয়ে উচ্চ শিক্ষার আশায় শহরে পাড়ি জমায় অনেক ক্ষেত্রেই তারা আশাহত হয়। দীর্ঘমেয়াদী বিষয় কোর্স, আবাসন সমস্যা, সেশন জট, সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা প্রভৃতি বিষয় ছাত্রীদেরকে মানসিক ও আর্থিক দিক থেকে বিপর্যস্ত করে তোলে। তাই এ সব বাধা দূর করে আমাদের নিজেদের সাথেই নারী শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। আর এ জন্য নারীকেও এগিয়ে আসতে হবে।

ইসলামী নারী শিক্ষায় সামাজিক সহযোগিতা

একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণের রূপরেখাইসলামে জ্ঞান অর্জন কেবল পুরুষের একক অধিকার নয়, বরং নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই এটি একটি অপরিহার্য ধর্মীয় কর্তব্য। একটি আদর্শ, নৈতিক ও প্রগতিশীল সমাজ গঠনে নারীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। আর নারীদের এই শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে পরিবার থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত সামাজিক সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামে নারী শিক্ষার ভিত্তি ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটইসলামের স্বর্ণযুগে নারীরা কেবল গৃহস্থালি কাজেই সীমাবদ্ধ ছিলেন না, বরং তারা শিক্ষা, চিকিৎসা, রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা.): তিনি ছিলেন তৎকালীন ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুহাদ্দিস ও আইনজ্ঞ। সাহাবিরা জটিল ধর্মীয় সমস্যার সমাধানে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর উদ্যোগ: মহানবী (সা.) সপ্তাহের একটি নির্দিষ্ট দিন নারীদের দ্বিনি ও ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। ফাতেমা আল-ফিহরি: বিশ্বের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় 'আল-কারাউইন' (মরক্কো) একজন মুসলিম নারী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইসলামী নারী শিক্ষায় সামাজিক সহযোগিতার প্রধান ক্ষেত্রসমূহনারীদের জন্য নিরাপদ, নৈতিক এবং মানসম্মত শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করতে সমাজের প্রতিটি স্তরের যৌথ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। এই সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোকে নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো: ১. পারিবারিক সহযোগিতা ও মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনপরিবার হলো শিক্ষার প্রথম পাঠশালা। সামাজিক সহযোগিতার সূচনা ঘটে ঘর থেকে। বৈষম্যহীন মানসিকতা: কন্যাসন্তানকে বোঝা বা পরের ঘরের আমানত মনে করে অবহেলা না করা। ছেলে ও মেয়ের শিক্ষার সুযোগে সমতা আনা। অনুপ্রেরণা প্রদান: মেয়েদের উচ্চশিক্ষা ও গবেষণামূলক কাজে পারিবারিক ও মানসিক সমর্থন দেওয়া। আদর্শ পরিবেশ তৈরি: ঘরের ভেতর দ্বিনি ও নৈতিক চর্চার পরিবেশ বজায় রাখা, যা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকে আরও অর্থবহ করে তোলে। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো উন্নয়ন ও সামাজিক উদ্যোগসমাজকে সম্মিলিতভাবে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে যা ধর্মীয় অনুশাসন ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটায়। পৃথক ও নিরাপদ ক্যাম্পাস: মেয়েদের জন্য পর্দার বিধান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করে আলাদা স্কুল, কলেজ এবং মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা। সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রম: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য

ইসলামসম্মত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ব্যবস্থা করা। অভিভাবক-শিক্ষক ফোরাম: স্থানীয় পর্যায়ে নিয়মিত মতবিনিময় সভার আয়োজন করা, যেখানে মেয়েদের শিক্ষার অগ্রগতি ও সামাজিক বাধাগুলো নিয়ে আলোচনা করা যায়। ৩. ধর্মীয় নেতৃত্ব ও আলেম সমাজের ভূমিকামুসলিম সমাজে আলেম ও খতিবদের কথার গভীর প্রভাব রয়েছে। তারা নারী শিক্ষার প্রসারে সবচেয়ে বড় সামাজিক অনুঘটক হতে পারেন। জুমার খুতবা ও ওয়াজ মাহফিল: ইসলামে নারী শিক্ষার গুরুত্ব, নারীর অধিকার এবং রাসূল (সা.)-এর যুগের মুসলিম নারীদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস জনগণের সামনে তুলে ধরা। কুসংস্কার দূরীকরণ: "নারীদের বেশি পড়াশোনার প্রয়োজন নেই"—এমন ভুল ও মনগড়া ধর্মীয় ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে জোরালো অবস্থান নেওয়া। ৪. অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও তহবিল গঠনঅনেক সময় আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে মেধা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা পড়ালেখা বন্ধ করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে সমাজের বিভবানদের এগিয়ে আসতে হবে। যাকাত ও সদকার সঠিক ব্যবহার: যাকাতের একটি অংশ দরিদ্র ও এতিম মেয়েদের শিক্ষার পেছনে ব্যয় করা। বিশেষ স্কলারশিপ: সামাজিক সংগঠনগুলোর উদ্যোগে "নারী শিক্ষা তহবিল" গঠন করে মেধাবী ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদান করা। যাতায়াত ও আবাসন সুবিধা: দূরবর্তী অঞ্চলের ছাত্রীদের জন্য নিরাপদ সামাজিক হোস্টেল ও বিনামূল্যে যাতায়াত (বাস সার্ভিস) ব্যবস্থার স্পন্সর করা। ৫. সচেতনতামূলক সামাজিক ক্যাম্পেইন ও আইনি সহায়তাসামাজিকভাবে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নারী শিক্ষার পথকে মসৃণ করা সম্ভব। বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ: সমাজে বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা। কারণ বাল্যবিবাহ মেয়েদের মাঝপথেই শিক্ষা জীবন থেকে ছিটকে ফেলে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ: ইভটিজিং, সামাজিক হেনস্তা এবং সাইবার বুলিংয়ের বিরুদ্ধে পাড়ায় পাড়ায় সামাজিক প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা। সামাজিক সহযোগিতার সুদূরপ্রসারী প্রভাবনারীদের ইসলামী ও সাধারণ শিক্ষায় সমাজ যখন সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন তার সুফল পুরো সমাজ ভোগ করে: আদর্শ মায়ের মাধ্যমে সুশিক্ষিত প্রজন্ম: নেপোলিয়নের বিখ্যাত উক্তি, "আমাকে একজন শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাদের একটি শিক্ষিত জাতি দেব"—এর প্রতিফলন ইসলাম অনেক আগেই দেখিয়েছে। একজন শিক্ষিত মা সন্তানকে শৈশব থেকেই নৈতিকতা ও দ্বীনের সঠিক শিক্ষা দিতে পারেন। নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান: শিক্ষিত নারীরা পরবর্তীতে পর্দার পরিবেশ রক্ষা করে শিক্ষিকা, নারী চিকিৎসক, ও গাইনি বিশেষজ্ঞ হিসেবে

সমাজের অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে (নারীদের) সেবা দিতে পারেন। সামাজিক ভারসাম্য ও অপরাধ হ্রাস: দ্বীনি শিক্ষায় শিক্ষিত নারী পারিবারিক কলহ দূর করতে এবং সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ ছড়িয়ে দিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

উপসংহার

পরিবার সমাজের মূল ভিত্তি এবং একটি সুস্থ, সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান। পরিবারে শান্তি, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা ও মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন নারী একজন মা, স্ত্রী, কন্যা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রথম শিক্ষক হিসেবে পরিবার গঠন ও পরিচালনায় কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেন। তাই নারী শিক্ষার মান ও পরিধি একটি পরিবারের সামগ্রিক অবস্থার ওপর সরাসরি প্রভাব ফেলে। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা একজন নারীকে ধর্মীয় জ্ঞান, নৈতিক মূল্যবোধ, দায়িত্ববোধ এবং পারিবারিক জীবনের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান করে। কিন্তু বর্তমান সমাজে ইসলামী নারী শিক্ষার ঘাটতির কারণে পারিবারিক জীবনে নানা ধরনের সমস্যা ও অবক্ষয় লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এই গবেষণায় ইসলামী নারী শিক্ষার গুরুত্ব, নারী শিক্ষার অভাবে সৃষ্ট পারিবারিক সমস্যাসমূহ এবং এসব সমস্যার কার্যকর প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। গবেষণার শুরুতে কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামে শিক্ষার গুরুত্ব এবং নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলাম নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য জ্ঞান অর্জনকে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবে বিবেচনা করেছে। একজন শিক্ষিত নারী পরিবারে নৈতিকতা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং মানবিক গুণাবলি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। অন্যদিকে শিক্ষার অভাবে নারী নিজের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন না, যা পারিবারিক অশান্তি ও অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গবেষণায় দেখা গেছে যে ইসলামী নারী শিক্ষার অভাবের ফলে দাম্পত্য জীবনে ভুল বোঝাবুঝি, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের ঘাটতি এবং পারিবারিক কলহ বৃদ্ধি পায়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ইসলামী মূল্যবোধ ও দায়িত্ব সম্পর্কে

যথাযথ জ্ঞান না থাকলে পারিবারিক জীবনে ভারসাম্য নষ্ট হয়। ফলে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ে এবং পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি হয়।

এ গবেষণায় আরও তুলে ধরা হয়েছে যে নারী শিক্ষার অভাব সন্তানের নৈতিক ও চারিত্রিক বিকাশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একজন মা সন্তানের প্রথম শিক্ষক হওয়ায় তার জ্ঞান, নৈতিকতা ও ধর্মীয় চেতনা সন্তানের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। যখন মা ইসলামী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হন, তখন সন্তানদের যথাযথ ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। এর ফলে সন্তানদের মধ্যে অবাধ্যতা, অসামাজিক আচরণ, নৈতিক অবক্ষয় এবং মূল্যবোধের সংকট দেখা দিতে পারে।

গবেষণায় বর্তমান সমাজে পারিবারিক অবক্ষয়ের বিভিন্ন কারণ যেমন—ধর্মীয় শিক্ষার অভাব, নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নেতিবাচক প্রভাব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের অপব্যবহার, পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং ইসলামী জীবনব্যবস্থা থেকে দূরে সরে যাওয়ার বিষয়গুলোও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এসব কারণ পরিবারে অশান্তি, বিচ্ছিন্নতা এবং সামাজিক অবক্ষয় বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

এ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো পারিবারিক অবক্ষয় রোধে ইসলামী নারী শিক্ষার ভূমিকা ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নির্ধারণ করা। গবেষণায় সুপারিশ করা হয়েছে যে নারীদের জন্য কুরআন-হাদিসভিত্তিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা এবং পারিবারিক জীবন সম্পর্কিত ইসলামী জ্ঞান বিস্তারের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। পরিবারে ধর্মীয় অনুশীলন বৃদ্ধি, সন্তানদের ইসলামী মূল্যবোধে গড়ে তোলা, দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং সামাজিকভাবে নারী শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামী নারী শিক্ষা কেবল একজন নারীর ব্যক্তিগত উন্নয়নের জন্য নয়; বরং একটি আদর্শ পরিবার, নৈতিক সমাজ এবং সুস্থ জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য। একজন শিক্ষিত ও সচেতন নারী পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন। তাই পারিবারিক অবক্ষয় রোধ এবং সমাজে নৈতিকতা ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামী নারী শিক্ষার প্রসার সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামী নারী শিক্ষার অভাব পারিবারিক অবক্ষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। পরিবার ও সমাজকে নৈতিক সংকট থেকে রক্ষা করতে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সুশিক্ষিত ও আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ইসলামী নারী শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ইসলামী নারী শিক্ষার প্রসার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। এর মাধ্যমেই একটি শান্তিপূর্ণ, নৈতিক ও কল্যাণমুখী সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।